3 মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র পদার্থ

ধাতু ও অধাতু

আমাদের চারপাশে আমরা যে জিনিসগুলো দেখতে পাই সেগুলোকে আমরা সাধারণভাবে বস্তু বলি। আবার ওই বস্তুর মধ্যে যে উপাদান আছে তা হলো পদার্থ। আমাদের রোজকার ব্যবহারের কিছু জিনিসের কথা মনে করো — লোহার আলমারি লোহা দিয়ে তৈরি, প্লাস্টিকের মগ-বালতি প্লাস্টিক থেকে তৈরি। লোহা, প্লাস্টিক — এগুলো যেমন কঠিন পদার্থ, তেমনি জল, সরষের তেল, কাশির সিরাপ — এগুলো তরল পদার্থ। আবার বায়ুতে যেমন বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ মিশে আছে, তেমনি ধূপের ধোঁয়া বা গাড়ির ধোঁয়াতে বিভিন্ন গ্যাসের সঙ্গে মিশে আছে বিভিন্ন কঠিন কণা। দেখা যাচ্ছে পদার্থের অবস্থা নানা ধরনের হতে পারে— কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়। কিন্তু সব কঠিন পদার্থই কি একইরকমের?

করে দেখো

একটা এক টাকার বা দু-টাকার কয়েন যদি হাত থেকে সিমেন্টের মেঝেতে পড়ে, কেমন শব্দ শুনতে পাও? এক টুকরো কাঠকয়লা একই জায়গায় ফেলে দেখো কেমন শব্দ হয়। হাত থেকে পড়ার পর কয়েনের আকার-আকৃতির কি কোনো পরিবর্তন দেখতে পাও? কাঠকয়লা ফেললে তার আকার-আকৃতির পরিবর্তন কি একইরকম হয়?

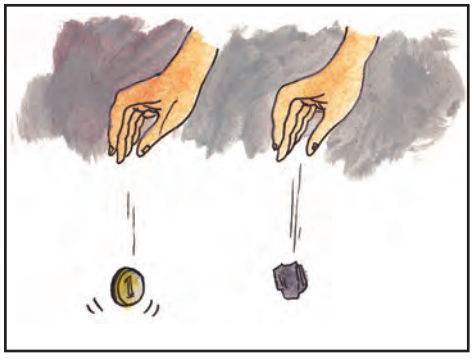

কী করা হলো	কী দেখলে ও কেমন শব্দ শুনলে
যখন এক টাকা বা দু-টাকার কয়েন ফেলা হলো	
যখন কাঠকয়লার টুকরো ফেলা হলো	

কী কী জিনিসে আঘাত করলে একইরকম শব্দ তৈরি হয়, যাদের বাঁকানো যায় ও পাতলা পাতে পরিণত করা যায় এরকম কয়েকটি পদার্থের উদাহরণ নীচের তালিকায় লেখো। আবার আঘাত করলে এরকম শব্দ হবে না, কিন্তু গুঁড়ো হয়ে যাবে এমন কয়েকটি জিনিসের নাম লেখো :

কেমন জিনিস	তাদের নাম
আঘাত করলে ঢং করে শব্দ হয়, বাঁকানো যায় ও পাতলা পাতে পরিণত হয়	
আঘাত করলে কোনোরকম ঢং শব্দ হয় না, গুঁড়ো হয়ে যায়	

তোমাদের পরিচিত কয়েকটা কঠিন পদার্থের আরো কয়েকটা ধর্ম কীভাবে বোঝা যাবে তার জন্য নীচের পরীক্ষাগুলো করো।

করে দেখো

(1) দু-টুকরো তামার তার, দুটো ছোটো পেরেক, একটা ব্যাটারি ও একটা ছোটো হোল্ডারসহ বালব নাও। এবার ছবির মতো করে তাদের জোড়া লাগাও। যা ঘটতে দেখছ তা লেখো।

(2) এবার একটা পেরেক খুলে নাও ও তার জায়গায় একটা সরু লম্বা কাঠকয়লার টুকরো ছবির মতো করে জোড়া লাগাও। আগের ঘটনা ও এখনকার ঘটনার বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের সারণিটি পূরণ করো।

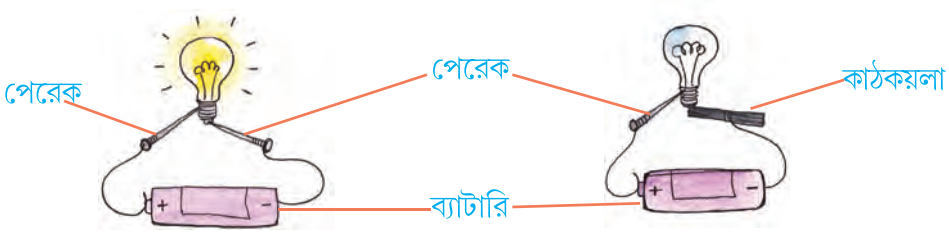

ঘটনা	কী দেখতে পেলে	কেন এমন হলো বলে মনে হয়
যখন লোহার পেরেক জোড়া ছিল		
যখন লোহার পেরেকের বদলে কাঠকয়লার টুকরো জোড়া হলো		

করে দেখো

1. একটা স্টিলের সাধারণ চামচের একটা প্রান্ত একটা জ্বলন্ত মোমবাতির শিখার মধ্যে কিছুক্ষণ ধরে রাখার পর তোমার অনুভূতি কেমন হয় তা নীচে লেখো।
2. একইভাবে প্লাস্টিকের হাতল লাগানো একটা স্টিলের চামচ মোমবাতির আগুনে ধরলে তোমার অনুভূতি কি একইরকম হয়?

তোমার অনুভূতি কেমন তা নীচে লেখো।

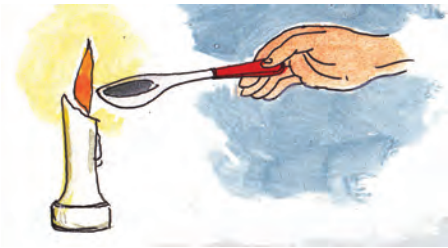

যখন আগুনে ধরা হলো	কী অনুভব করলে	কেন এমন অনুভূতি হলো বলে মনে হয়
স্টিলের চামচ		
প্লাস্টিকের হাতল লাগানো স্টিলের চামচ		

করে দেখো

তিনটে পরিষ্কার বাসন — একটা স্টিলের থালা, পেতলের রেকাবি ও একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটি রোদ্দুরে ধরো। সূর্যের আলো এই তিনটে জিনিসের ওপর কেমন দেখাচ্ছে তা লক্ষ করো। মিনিট পাঁচেক এভাবে ধরে রাখার পর পাত্রের পিছনের পিঠে হাত দিয়ে তাদের তাপমাত্রার পরিবর্তন বোঝার চেষ্টা করো। তোমরা যা দেখছ তার মিল বা অমিল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো। একটা প্লাস্টিকের তৈরি বাটি রোদ্দুরে ধরলেও কি একই ঘটনা দেখতে পাও?

কীসের তৈরি জিনিস	রোদ্দুরে ধরলে কী হয়

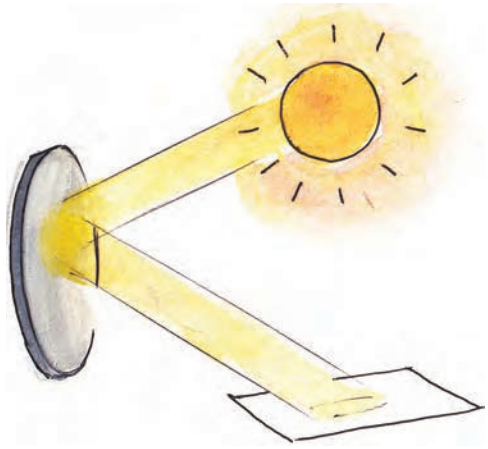

তুমি যদি কখনও কামারশালায় যাও কী দেখতে পাবে?

— দেখবে যে বিভিন্ন আকারের লোহা গরম করে, তাকে পিটিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি করা হচ্ছে। এইসব কাজ করার জন্য লোহাকেই কেন বেছে নেওয়া হলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো।

.....।

কাঠকয়লা বা প্লাস্টিককে গরম করে বা পিটিয়ে কি একইরকম কাজ করা যাবে?

— যাবে না। কারণ কাঠকয়লার বা প্লাস্টিকের মধ্যে লোহার মতো একইরকম গুণ নেই।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, পিতল ইত্যাদির কতকগুলো সাধারণ ধর্ম আছে। ধর্মগুলো কী কী?

1. এদের ওপরের তলে আলো পড়লে চকচক করে,
2. এদের আঘাত করলে ঠং করে একরকম বিশেষ শব্দ হয়,
3. এদের একটা ধারে গরম করলে সহজেই অন্য ধারটা গরম হয়ে যায়; এরা তাপ ও তড়িতের সুপরিবাহী,
4. এদের সরু খণ্ডকে সহজেই বাঁকানো যায়,
5. জোরে পিটলে চ্যাপটা হয়ে যায়।

এই কারণেই লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি পদার্থগুলো হলো ধাতু। আর কাঠকয়লার মতো পদার্থগুলো হলো অধাতু। ধাতু সাধারণত কঠিন। পারদ ধাতু হলেও তরল। আর অধাতুগুলো কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় হতে পারে। তবে গ্রাফাইট অধাতু হলেও তড়িতের পরিবাহী। হিরে অধাতু হলেও তাপের সুপরিবাহী।

নীচে তোমার চেনা কতকগুলি পদার্থের নাম দেওয়া হলো। শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সাধারণ ধর্ম কী কী হতে পারে সেগুলো লেখো। কোনগুলো ধাতু আর কোনগুলো অধাতু তা জেনে নাও ও সারণি আকারে লেখো।

সোনা, রুপো, অ্যালুমিনিয়াম, গন্ধক, দস্তা, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন।

ধর্মের মিল আছে এমন পদার্থের নাম	কী কী ধর্মের মিল দেখা যায়	ধাতু না অধাতু
	1. আলোতে চকচক করে 2. পিটলে শব্দ হয় 3. পাতে পরিণত হয় 4.	ধাতু
		অধাতু

বিশুদ্ধ ও মিশ্র পদার্থ

আমরা জানি যে বাতাসের মধ্যে অনেকগুলো উপাদান আছে। যেমন — 1. নাইট্রোজেন, 2. অক্সিজেন, 3. কার্বন ডাইঅক্সাইড, 4. জলীয় বাষ্প, 5. নিষ্ক্রিয় গ্যাস।

আবার যদি দুধ ফোটানো হয় দেখব দুধ ক্রমশ ঘন হতে থাকে। দুধ থেকে কী বেরিয়ে ঘন হয়?

ফোটানো দুধের ওপর একটা থালা কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রাখার পর তুললে কী দেখতে পাও?

.....।

এই জলটা কোথা থেকে এল বলো তো?

— ওই ফোটানো দুধ থেকেই, কারণ দুধ ঘন হবার সময় তার মধ্যে থাকা জলের পরিমাণ কমে যায়।

তাহলে দেখো, বাতাস বা দুধের মধ্যে একের বেশি পদার্থ মিশে থাকে। তাই এরা সকলেই মিশ্র পদার্থ।

করে দেখো

একটা কাঁচের গ্লাসে জল নাও। তার মধ্যে এক চামচ নুন গুলে দাও। এরপর তার মধ্যে আরো এক চামচ করে নুন, তিন-চারবার গোলার চেষ্টা করো। প্রথমবারের সঙ্গে শেষবার তৈরি হওয়া দ্রবণের নোনাভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটেছে কিনা লক্ষ করো।

তোমার পরিচিত কয়েকটি পদার্থের নাম নীচে দেওয়া হলো। এদের মধ্যে কোনগুলো মিশ্র পদার্থ তা শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছ থেকে জেনে নাও।

চিনির শরবত, ঠান্ডা পানীয়, মধু, বাজির মশলা, লোহার রং, গন্ধক, লোহা, জল, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, চিনি।

.....।

অন্য পদার্থগুলোকে তাহলে কী পদার্থ বলা যাবে?

যেগুলোর মধ্যে একাধিক পদার্থ মিশে নেই তারা বিশুদ্ধ পদার্থ। তাহলে ওপরের তালিকার মধ্যে থাকা বিশুদ্ধ পদার্থগুলো হলো .....।

কিন্তু লোহা ও জল দুটোই বিশুদ্ধ পদার্থ হলেও তারা কি একইরকম পদার্থ?

মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ

করে দেখো

একটা বিকারে কিছুটা পানীয় জল নাও। একটা রবারের টুকরোর মধ্যে দুটো ছোটো পেরেক পুঁতে পাশের ছবির মতো জলের মধ্যে ডোবাও। তিন-চারটে টর্চ জ্বালানোর সাধারণ ব্যাটারির সঙ্গে সাধারণ তামার তার যোগ করে ওই জলের মধ্যে ডোবানো দুটো পেরেকের মাথায় যোগ করো। পেরেক দুটোর গায়ে কী ঘটছে তা ভালো করে লক্ষ করো।

ভালো করে লক্ষ করলে দেখতে পাওয়া যাবে পেরেক দুটোর গায়ে বুদবুদের মতো গ্যাস জমা হচ্ছে। পেরেক দুটোর একটার গায়ে হাইড্রোজেন আর অন্যটার গায়ে অক্সিজেন জমা হচ্ছে। কেন বলত?

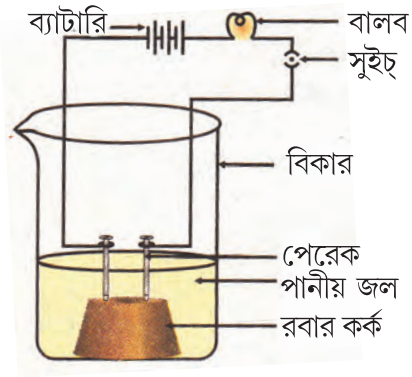

তড়িৎ চালানোর পর জল ভেঙে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন তৈরি হয়। এর থেকেই বোঝা যায় যে জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে তৈরি।

সতর্কতা : টর্চে ব্যবহার করা সাধারণ ব্যাটারি সাহায্যেই শুধু এই পরীক্ষা করবে। বাড়ির ইলেকট্রিক লাইন বা ইনভার্টারের লাইন থেকে কখনোই করবে না।

কিন্তু লোহাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তার মধ্যে লোহা ছাড়া আর কিছুই নেই। একইভাবে তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাদের মধ্যে শুধুমাত্র ওই পদার্থগুলোই আছে। লোহার মধ্যে লোহা ছাড়া আর কিছু নেই। এরকম পদার্থকে বলে মৌলিক পদার্থ। কিন্তু দুটি মৌলিক পদার্থ অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন জল উৎপন্ন করেছে। জল তরল পদার্থ, কিন্তু অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসীয় পদার্থ। জলের ধর্মের সঙ্গে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের ধর্মের কোনো মিল নেই।

বায়ুতে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস মিশে আছে।

আবার জলেও দুটো উপাদান— অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন আছে। তাহলে বায়ু ও জল কি একইরকম পদার্থ, না কোথাও তাদের তফাত আছে?

— পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে বায়ুর মধ্যে তার সবকটি উপাদানই তাদের নিজেদের ধর্ম বজায় রেখেছে। যেমন— অক্সিজেনের কথাই ধরা যাক। অক্সিজেন —

(i) আমাদের শ্বাসকার্যে সাহায্য করে।
(ii) কোনো জিনিস জ্বলতে সাহায্য করে।

করে দেখো

একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে, একটা কাচের গ্লাস দিয়ে ঢাকা দাও।

কী দেখলে	কেন এমন হলো বলে মনে হয়

প্রথমে গ্লাসের ফাঁকা অংশে কী ছিল? .....।

যতক্ষণ পর্যন্ত মোমবাতিটা যথেষ্ট অক্সিজেন পাচ্ছিল ততক্ষণ জ্বলছিল। তারপর যখন অক্সিজেন কমে এল, তখন মোমবাতিটা নিভে গেল।

অক্সিজেন কোনো জিনিসকে জ্বলতে সাহায্যে করে। বাতাসের মধ্যে অনেকের সঙ্গে মিশে থাকা সত্ত্বেও তার নিজের সেই ধর্ম বজায় থাকে। এই পরীক্ষাটা তার প্রমাণ।

(i) কোনো জ্বলন্ত জিনিসে জল ঢেলে দিলে কী ঘটে তা নিশ্চয়ই দেখেছ।

(ii) আবার এটাও জানো যে জলের উপাদানগুলো হলো অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন।

তাহলে দেখো, জলের মধ্যে থাকা অক্সিজেন এমনভাবে হাইড্রোজেনের সঙ্গে জোট বেঁধেছে যাতে জোট বাঁধার পর তার নিজের ধর্ম লোপ পেয়েছে — জলের অক্সিজেন আগুন জ্বলতে সাহায্য করেনি।

জলের উপাদান অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সঙ্গে জলের ধর্মের মিল বা অমিলগুলো নীচের সারণিতে লক্ষ করো ও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।

হাইড্রোজেনের ধর্ম	অক্সিজেনের ধর্ম	জলের ধর্ম
হাইড্রোজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন, গ্যাসীয় পদার্থ আর বাতাসের চেয়ে হালকা।	অক্সিজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন, গ্যাসীয় পদার্থ, বাতাসের চেয়ে সামান্য ভারী।	বর্ণহীন, গন্ধহীন, সাধারণ অবস্থায় তরল।
অক্সিজেনের উপস্থিতিতে আগুন দিলে হাইড্রোজেন গ্যাস নিজেই জ্বলে।	অক্সিজেন কোনো কিছুকে জ্বলতে সাহায্য করে, কিন্তু নিজে জ্বলে না।	কোনো কিছু জ্বলতে সাহায্য করে না।

পরীক্ষায় বোঝা যায় যে জলের মধ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তাদের নিজেদের ধর্ম বজায় রাখতে পারে নি। অর্থাৎ, জলের ধর্ম তার উপাদানগুলোর ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জল এমন একটা পদার্থ যা তৈরি হয়েছে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মধ্যে ঘটে যাওয়া রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে। তাই জল হলো একটা যৌগিক পদার্থ বা যৌগ।

করে দেখো

এক টুকরো ম্যাগনেশিয়াম ধাতুর ফিতে চিমটে দিয়ে আগুনে ধরো; আর নিজেরা আলোচনা করে লেখো।

কী দেখলে	কেন এমন হলো

পরীক্ষায় দেখা যাবে ম্যাগনেশিয়াম ধাতু জ্বালানোর পর একরকম সাদা গুঁড়ো তৈরি হয়েছে, যা দেখলেই বোঝা যাবে এই সাদা গুঁড়ো ম্যাগনেশিয়ামের থেকে আলাদা একটা পদার্থ। এখানে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ম্যাগনেশিয়াম ও বাতাসের অক্সিজেন জুড়ে একটা নতুন যৌগ তৈরি হয়। তার নাম ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড।

তোমরা জানো, বাতাসের একটা উপাদান হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড। নাম শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে এই গ্যাসীয় পদার্থ কার্বন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তৈরি একটা যৌগ।

এবার পরের পাতার সারণিতে কার্বন, অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ধর্মের তুলনা পড়ে দেখো।

কার্বনের ধর্ম	অক্সিজেনের ধর্ম	কার্বন ডাইঅক্সাইডের ধর্ম
(i) কালো রং-এর কঠিন পদার্থ (ii) অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জ্বালিয়ে দিলে জ্বলে	(i) বর্ণহীন গ্যাস (ii) জ্বলতে সাহায্য করে, (iii) শ্বাসকার্যে সাহায্য করে	(i) বর্ণহীন গ্যাস (ii) জ্বলতে সাহায্য করে না, (iii) শ্বাসকার্যে সাহায্য করে না

বাতাসের মতো মিশ্র পদার্থের মধ্যে তার উপাদানগুলো নিজেদের ধর্ম বজায় রাখতে পারে। মিশ্র পদার্থে উপাদানগুলির পরিমাণও বদলে যেতে পারে। বাতাসের উপাদানগুলোর পরিমাণ কি স্থান বা ঋতুভেদে একই থাকে?

নীচের ঘটনাগুলো কেন ঘটে তা শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছ থেকে জেনে নাও ও নীচের সারণিতে লেখো:

কী ঘটনা	কেন ঘটে
(i) উঁচু পাহাড়ের ওপরে শ্বাসকষ্ট হয়	
(ii) বর্ষাকালে ভিজে কাপড় শুকোতে দেরি হয়	

আমাদের চারিদিকে মিশ্র ও যৌগ এই দু-ধরনের পদার্থের সংখ্যাই বেশি, আবার কিছু পদার্থ আছে যারা একটামাত্র উপাদানেই তৈরি। যেমন — বিশুদ্ধ লোহা, তামা, সোনা, রুপো, কার্বন।

তোমরা জানো যে বড়ো জিনিসকে ভাঙলে ছোটো ছোটো টুকরো পাওয়া যায়। নীচের ছবি তিনটি দেখো; তিনটি বোতলেই একই ওজনের লোহার টুকরো আছে।

A

B

C

এবার ভেবে বলো।

কোনটায় লোহার টুকরোগুলো সবচেয়ে বড়ো? ☐

কোনটায় লোহার টুকরোর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি? ☐

কোনটায় খালিচোখে প্রত্যেকটা টুকরোকে চেনা শক্ত? ☐

কোনটায় একটা একটা করে টুকরো বা গুঁড়ো গোনা শক্ত? ☐

তাহলে আমরা বলতে পারি কি —

কোনো জিনিসকে ক্রমাগত ভাঙতে থাকলে টুকরোগুলো ক্রমশ ছোটো হতে থাকবে।

টুকরোগুলো যতই ছোটো হতে থাকবে প্রত্যেকটাকে আলাদা করে দেখা এবং চিনতে পারা ততই শক্ত হয়ে পড়বে।

লোহার মতোই সোনা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, রুপো, দস্তা বা কার্বন (কাঠকয়লা) — এদের যে-কোনো একটার ছোটো টুকরোকে যদি আরো ছোটো করে ফেলা যায় তাহলে তাদের বেলাতেও আরো ছোটো টুকরোগুলো চেনা শক্ত হয়ে পড়বে।

ছোটো টুকরো করতে করতে এসব মৌলিক পদার্থের এমন ক্ষুদ্রতম কণা পাওয়া যাবে যা চোখে দেখা যায় না এবং যার মধ্যে ওই পদার্থের গুণগুলো আছে; মৌলের ওই ক্ষুদ্রতম কণা যার মধ্যে ওই মৌলের গুণগুলো বর্তমান সেই ক্ষুদ্রতম কণাকে মৌলের পরমাণু বলে। কিন্তু পরমাণুকে আরো ভাঙলে তার মধ্যে মৌলের গুণগুলো আর বজায় থাকবে না।

(i) তাহলে আমরা জানলাম যে মৌলিক পদার্থ পরমাণু দিয়ে তৈরি।

(ii) আমরা জানি, যৌগিক পদার্থ একাধিক মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি। তাহলে যৌগিক পদার্থের মধ্যেও একাধিক মৌলের পরমাণু আছে।

কয়েকটি পরিচিত যৌগে কী কী মৌলের পরমাণু থাকতে পারে তা নীচের সারণিতে লেখো:

যৌগের নাম	কী কী মৌলের পরমাণু দিয়ে তৈরি
জল	
কার্বন ডাইঅক্সাইড	
চিনি	কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন
নুন	সোডিয়াম, ক্লোরিন
পাথুরে চুন	ক্যালশিয়াম, অক্সিজেন

দেখা যাক, মৌলিক, যৌগিক বা মিশ্র পদার্থের তফাত কোথায়।

বেশ কিছু ধাতব বা অধাতব মৌলের পরমাণু স্বাধীনভাবে থাকতে পারে। অন্য মৌলগুলো যাদের পরমাণু স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না তারা তাহলে কেমনভাবে থাকে?

সেই মৌলগুলোর একাধিক পরমাণু একসঙ্গে জুড়ে থাকে। পরমাণুদের ওই জোটবদ্ধ অবস্থাকে ওই মৌলের অণু বলে। নীচের ছবিতে লক্ষ করো কীভাবে মৌলের পরমাণু জুড়ে ওই মৌলের অণু তৈরি হয়। যে-কোনো পদার্থের খালি চোখে দেখার মতো নমুনায় বহু লক্ষ-কোটি অণু-পরমাণু থাকে।

আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন মৌল জুড়ে যৌগিক পদার্থ তৈরি হয়। যৌগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ছোটো যে কণা স্বাধীনভাবে থাকতে পারে ও যে কণার মধ্যে যৌগের ধর্ম বর্তমান থাকে তা হলো যৌগের অণু। একই মৌলের একাধিক পরমাণু জুড়লে তৈরি হয় মৌলের অণু আর ভিন্ন মৌলের পরমাণুরা জুড়লে তৈরি হয় যৌগের অণু। পরের পাতার ছবিতে কয়েকটি পরিচিত যৌগের অণুর গঠন দেখানো হয়েছে। পরমাণুর রং হয়না, ওটা বোঝাবার জন্য আঁকা হয়েছে।

ছবিগুলো দেখে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের তালিকা পূরণ করো:

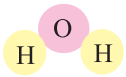

জল

হাইড্রোজেন ক্লোরাইড বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড

কার্বন ডাইঅক্সাইড

কোন যৌগের অণু	কী কী মৌল দিয়ে গঠিত	একটা অণুতে কোন মৌলের কটা পরমাণু আছে
জল		
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড		
কার্বন ডাইঅক্সাইড		

এখানে মৌলের পরমাণুগুলোকে গোলকের আকারে দেখানো হয়েছে। আর মৌলগুলোকে চেনার জন্য তাদের নাম সংক্ষেপে ওই গোলকের মধ্যে লেখা হয়েছে। মৌলের এই সংক্ষিপ্ত নামকেই মৌলের চিহ্ন বলে।

মৌলগুলোর চিহ্ন কীভাবে পাওয়া যায়?

চিহ্ন, সংকেত ও যোজ্যতা

চিহ্ন

হাইড্রোজেন, কার্বন ও অক্সিজেন এই তিনটে মৌলের নামের ইংরাজি বানানগুলো দেখো — Hydrogen, Carbon ও Oxygen। এই তিনটে বানান লিখতে কতটা জায়গা লেগে গেল! তাহলে বিজ্ঞান বইতে বারবার এই পদ্ধতিতে মৌলগুলোর নাম লিখলে বিজ্ঞানের বইটা কত মোটা হবে তা একবার ভেবে দেখো। তাই বিজ্ঞানীরা মৌলগুলোর নাম ছোটো করে লেখার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। Hydrogen শব্দের বদলে H, Oxygen শব্দের বদলে O এবং Carbon শব্দের বদলে C দিয়ে লিখলে অনেক কম জায়গা লাগে। অর্থাৎ মৌলগুলোর ইংরাজি নামের প্রথম অক্ষরটা বড়ো হরফে লিখে অনেক মৌলকে চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। শুধু মৌলের চিহ্ন জানলেই কি আমাদের চলবে? যখন আমাদের এইসব মৌলের পরমাণুর কথা বলতে হবে তখন আমরা কী করব? তখন আমরা হাইড্রোজেন, অক্সিজেন আর কার্বনের পরমাণুকে বোঝাতেও যথাক্রমে H, O, ও C ব্যবহার করব। এতে কোন যৌগে কি কি মৌল আছে তা সংক্ষেপে বোঝাতে আমাদের সুবিধে হবে।

এবার তোমরা ওই একই পদ্ধতি ব্যবহার করে নীচের মৌলগুলোর চিহ্ন লেখো।

মৌলের নাম	ইংরাজি শব্দ	চিহ্ন
নাইট্রোজেন	Nitrogen	
বোরন	Boron	
সালফার	Sulphur	
ফসফরাস	Phosphorus	
আয়োডিন	Iodine	
ফ্লুওরিন	Fluorine	

এবার তোমরা তোমাদের শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে এই পদ্ধতির সাহায্যে আরও কিছু মৌলের চিহ্ন জানার চেষ্টা করো।

প্রকৃতিতে প্রায় বিরানব্বইটি মৌল পাওয়া যায়। সমস্ত মৌলের চিহ্ন ওই একই পদ্ধতিতে লিখে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে নানা অসুবিধাও আছে। যেমন কার্বন (Carbon)-কে যদি তার ইংরাজি বানানের আদ্যক্ষরের (C) বড়ো হাতের হরফ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে ক্যালশিয়াম (Calcium)-এর চিহ্ন কী হবে? তাদের চিহ্ন লেখার জন্য অন্য একটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে ইংরাজি বানানের প্রথম দুটি অক্ষর ব্যবহার করে মৌলের চিহ্ন লেখা হয়।

এই ক্ষেত্রে ক্যালশিয়ামের চিহ্ন Ca দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। ভালো করে লক্ষ করো মৌলের চিহ্ন যেখানে দুটি অক্ষর আছে সেখানে প্রথম অক্ষরটি Capital letter এবং দ্বিতীয়টি Small letter ব্যবহার করা হয়েছে।

এবার তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের তালিকাটি পূরণ করো।

মৌলের নাম	ইংরাজি শব্দ	মৌলের চিহ্ন
কোবাল্ট	Cobalt	
হিলিয়াম	Helium	
লিথিয়াম	Lithium	
বেরিলিয়াম	Beryllium	
বেরিয়াম	Barium	
ব্রোমিন	Bromine	

উপরের ওই একই পদ্ধতি ব্যবহার করে তোমরা ক্রোমিয়াম (Chromium), ক্লোরিন (Chlorine), ম্যাগনেশিয়াম (Magnesium), ম্যাঙ্গানিজ (Maganese) মৌলগুলোর চিহ্ন লেখার চেষ্টা করো। এতে তোমার কী অসুবিধা হচ্ছে তা সংক্ষেপে লেখো।

.....

..... ।

এবার তোমরা ওই মৌলগুলোর চিহ্নের ক্ষেত্রে ইংরাজি প্রথম অক্ষরের সঙ্গে দ্বিতীয় অক্ষরের বদলে রং দিয়ে চিহ্নিত অক্ষরটি ব্যবহার করে চিহ্ন লেখার চেষ্টা করে দেখো তো ওই সমস্যা দূর হচ্ছে কিনা।

মৌলের নাম	ইংরাজি শব্দ	চিহ্ন
ক্লোরিন	Chlorine	
ক্রোমিয়াম	Chromium	
ম্যাঙ্গানিজ	Manganese	
ম্যাগনেশিয়াম	Magnesium	

তোমরা কি জানো রুপোকে আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নামে চেনে। তাহলে পৃথিবীতে রুপোর আর কত নাম থাকতে পারে। কোথাও রুপোকে রজত বা চাঁদি বলে। কোথাও সিলভার, আবার প্রাচীনকালে আর্জেনটাম বলা হতো। বিভিন্ন মৌলের নানা নাম থাকলেও বিজ্ঞানীরা প্রত্যেক মৌলের জন্য একটি চিহ্ন নির্দিষ্ট করেছেন। বহু মৌলের ইংরাজি নাম ব্যবহার না করে মৌলের ল্যাটিন নামের প্রথম বা প্রথম দুটি অক্ষর অথবা প্রথম অক্ষরের সঙ্গে অন্য অক্ষর দিয়ে চিহ্ন প্রকাশ করা হয়েছে।

তোমরা শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে নীচের সারণিটি পূরণ করো:

মৌলের নাম	মৌলের ল্যাটিন নাম	চিহ্ন
পটাশিয়াম	Kalium	
সোডিয়াম	Natrium	Na
তামা	Cuprum	
লোহা	Ferrum	
সোনা	Aurum	
রুপা	Argentum	Ag

সংকেত

আমরা আগেই জেনেছি ধাতু বা নিষ্ক্রিয় মৌল ছাড়া সাধারণত পরমাণু স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না। মৌল অণু বা যৌগ অণু পরমাণু দ্বারা গঠিত। অণু স্বাধীনভাবে থাকতে পারে।

কোনো একটি মৌলিক পদার্থের অণু ওই মৌলের পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। হাইড্রোজেনের অণুতে হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণু আছে। তাই হাইড্রোজেন অণুর সংকেত H_2 দিয়ে প্রকাশ করা হয়। সংকেত লেখার সময় লক্ষ করলে দেখা যাবে হাইড্রোজেনের চিহ্ন H লিখে হাইড্রোজেনের অণুতে উপস্থিত পরমাণুর সংখ্যা 2-কে চিহ্নের ডান দিকে একটু নীচে লেখা হয়েছে।

তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের সারণি পূরণ করো।

মৌলের নাম	মৌলের একটি অণুতে উপস্থিত পরমাণুর সংখ্যা	মৌলের অণুর সংকেত
অক্সিজেন	2	
নাইট্রোজেন	2	
ক্লোরিন	2	
সাদা ফসফরাস	4	
আয়োডিন	2	
ফ্লুওরিন	2	

মৌলের অণুতে যত সংখ্যক পরমাণু থাকে তাকে ওই মৌলের পারমাণবিকতা বলে।

এবার আমরা কিছু অধাতুর যৌগের সংকেত কীভাবে লেখা হয় তা দেখব। কোনো যৌগের সংকেত লিখতে হলে যৌগটি যে যে মৌলের পরমাণু দিয়ে তৈরি তাদের চিহ্ন পাশাপাশি লিখতে হয়। তবে মৌলের চিহ্নগুলো পাশাপাশি লেখাটার কিছু নিয়ম আছে তা আমরা পরে জানব। তারপর যে মৌলের যতগুলো পরমাণু আছে সেই সংখ্যাটা তার চিহ্নের নীচে ডানদিকে লিখতে হয়। ধরো তোমাকে বলা হলো জলের একটা অণুতে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু আর একটা অক্সিজেন পরমাণু আছে। তাহলে তুমি জলের সংকেত লিখবে H_2O_1। অণুতে যদি কোনো মৌলের একটাই পরমাণু থাকে তবে সেই 1 আর লেখা হয় না। শুধু চিহ্ন লেখা হয়। তাহলে জলের সংকেত হলো H_2O।

এবার তোমরা শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের সারণি পূরণ করো।

যৌগের নাম	অণুতে কোন মৌলের কটি পরমাণু আছে	সংকেত লেখার নিয়ম	সংকেত
কার্বন ডাইঅক্সাইড	C একটি; O দুটি	আগে C; পরে O	CO_2
কার্বন মনোক্সাইড	C একটি; O-একটি	আগে .....; পরে	
মিথেন	C একটি; H - চারটি	আগে C পরে H	
অ্যামোনিয়া	N .....; H	আগে ....., পরে	NH_3
হাইড্রোজেন সালফাইড	H- দুটি; S - একটি	আগে H, পরে S	
.....	S - একটি; O দুটি	আগে S, পরে O	
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড	H - একটি; Cl- একটি	আগে H, পরে Cl	

এবার তোমরা শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সাহায্যে নীচের সারণি পূরণ করে কোথায় ডাই, ট্রাই, টেট্রা বা পেন্টা প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় তা জানার চেষ্টা করো।

যৌগের নাম	সংকেত	ব্যাখ্যা
কার্বন ডাইঅক্সাইড	CO_2	2 টি O পরমাণু বলে ডাইঅক্সাইড
ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড	PCl_3	3টি Cl পরমাণু বলে ট্রাইক্লোরাইড
.....	CCl_4	4টি Cl পরমাণু বলে টেট্রাক্লোরাইড
.....	PCl_5	5টি Cl পরমাণু বলে পেন্টাক্লোরাইড
ফসফরাস	PF_3	
সালফার	SO_3	3টি O পরমাণু বলে .....

যোজ্যতা

এসো আমরা নীচের সারণি ভালো করে লক্ষ করি।

যৌগের নাম	সংকেত	যৌগে উপস্থিত বিভিন্ন পরমাণু	ভিন্ন মৌলের একটি পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত H পরমাণুর সংখ্যা
জল	H_2O	অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন	2
মিথেন	CH_4	কার্বন ও হাইড্রোজেন	
অ্যামোনিয়া	NH_3	N ও H	
ফসফিন	PH_3	P ও H	
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড	HCl	H ও Cl	
হাইড্রোজেন আয়োডাইড	HI	H ও I	
হাইড্রোজেন সালফাইড	H_2S	H ও S	

আগের পৃষ্ঠার সারণিতে আমরা লক্ষ করলাম অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার, আয়োডিন, ফ্লুওরিন, ক্লোরিন-এর একটি পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করেছে। দুটি মৌলের পরস্পর যুক্ত হওয়ার ক্ষমতাকে যোজন ক্ষমতা বা যোজ্যতা বলে। কোনো মৌলের একটি পরমাণু যত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে সেই সংখ্যা দিয়ে হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত মৌলের যোজ্যতা নির্ণয় করা হয়।

এবার তুমি আগের পাতায় যা পড়লে তা থেকে নীচের সারণি পূরণ করো।

মৌল	চিহ্ন	যোজ্যতা
অক্সিজেন	O	
নাইট্রোজেন	N	
কার্বন	C	
সালফার	S	
ক্লোরিন	Cl	
ফ্লুওরিন	F	
আয়োডিন	I	

এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার হাইড্রোজেনের যোজ্যতা 1 ধরে অন্য মৌলের যোজ্যতা নির্ণয় করা হয়েছে। একে হাইড্রোজেন ভিত্তিক যোজ্যতা বলে।

বিভিন্ন ধরনের মিশ্রণ

আমরা আগেই জেনেছি যে একাধিক পদার্থ মিশে গিয়েই তৈরি হয় মিশ্র পদার্থ বা মিশ্রণ। দ্রবণও একধরনের মিশ্রণ। জলে যখন তুমি চিনি বা নুন গুলে দাও তখন চিনির শরবত বা নুন জল তৈরি হয়। এগুলো হলো জলের মধ্যে চিনি বা নুনের দ্রবণ। দ্রবণ তৈরির সময় যে পদার্থটা গুলে গেল সেটা দ্রাব আর যার মধ্যে গুলে গেল সেটা দ্রাবক।

তাহলে ওপরের দুটো দ্রবণে দ্রাব ও দ্রাবক কী কী তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো।

কী দ্রবণ	দ্রাব	দ্রাবক
চিনির শরবত		
নুন জল		

দ্রবণ তৈরি করার সময় শুধুমাত্র যে তরল দ্রাবকের মধ্যেই কঠিন দ্রাব মেশানো হয় তা নয়, দুটো বা তার বেশি তরল মিশেও দ্রবণ তৈরি হতে পারে। আবার তরলে গ্যাস মিশেও দ্রবণ তৈরি হতে পারে। পুকুরের জলে অক্সিজেন গ্যাস দ্রবীভূত হয় বলেই মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী বেঁচে থাকে।

তোমরা দেখলে জলে গোলার পর চিনিকে আর দেখা যাচ্ছে না। জলে গোলার পর চিনির দানাগুলো গেল কোথায়?

— আসলে তোমরা চিনির যে দানাকে দেখতে পাচ্ছিলে সেটা একটা অণু নয়। ওতে লক্ষ লক্ষ চিনির অণু ছিল যাদের খালি চোখে দেখা যায় না। সবাই মিলে জোট বেঁধে যে সমষ্টি তৈরি করেছিল তাকেই তোমরা দেখতে পাচ্ছিলে। এখন জল এসে

সেই সমষ্টি থেকে চিনির অণুদের আলাদা করে ফেলেছে। চিনির অণুরা এখন জলের অণুদের সঙ্গে মিশে দ্রবণের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। চিনির দ্রবণের মধ্যে চিনি ও জল তাদের নিজেদের ধর্ম বজায় রেখে শুধু মিশ্রিত অবস্থায় দ্রবণের মধ্যে আছে। জেনে রাখো দ্রাব যদি রঙিন হয় তাহলে জলীয় দ্রবণও রঙিন হবে। আমাদের পরিচিত কয়েকটি মিশ্রণের উদাহরণ নীচের সারণিতে দেওয়া হলো। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কী কী মিশে এই মিশ্রণগুলো তৈরি হয়েছে তা লেখো:

কোন মিশ্রণ	কী কী মিশে তৈরি হয়েছে
নুন জল	
চিনির শরবত	
কাদাগোলা জল	
চুন জল	
বায়ু	

- জলে গোলার পর চিনি যে হারিয়ে যায়নি তা বুঝতে কী কী পরীক্ষা করা যেতে পারে?
- দুটো একই রকমের কাচের শিশির একটায় মাঝামাঝি পর্যন্ত জল ঢালো। অন্যটায় সমান উচ্চতা পর্যন্ত কোনো একটা তেল ঢালো। দুটোতেই সামান্য পরিমাণ নুন দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঝাঁকিয়ে রেখে দাও। তোমার পরীক্ষার ফলাফল সারণি আকারে লিপিবদ্ধ করো। তুমি এই পরীক্ষাটা তোমার চেনা যত রকমের তেল আছে তা নিয়ে করে একই রকম ফলাফল পাও কিনা দেখো। পরীক্ষা থেকে তুমি কী দেখলে—নুন জলে বেশি দ্রাব্য, না তেলে বেশি দ্রাব্য?
- একটা শিশিতে কোনো একটা তেল আর জল নিয়ে শিশির মুখ বন্ধ করো। বেশ কিছুক্ষণ ঝাঁকিয়ে রেখে দাও। পরীক্ষা করে তুমি যা দেখলে আর যা বুঝলে তা সারণি আকারে লিপিবদ্ধ করো।

মিশ্রণ পৃথককরণের পদ্ধতি

পরিস্রাবণ

তোমাদের এলাকায় হঠাৎ করে দেখা গেল পানীয় জলের কল থেকে কাদাগোলা জল পড়ছে। কিন্তু পানীয় জল তো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই জল কিছুক্ষণ রেখে দিলেই কাদা থিতিয়ে পড়বে নীচের দিকে। তখন ওপরের এই পরিষ্কার জলটা ঢেলে নিলেই হলো। কিন্তু এই পদ্ধতিতে পাওয়া জল খালি চোখে পরিষ্কার দেখায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ওই জল দেখলে কী দেখা যাবে?

দেখা যাবে যে ওই জলের সমস্ত কাদার কণা দূর হয়নি।

কাদা মেশানো জল থেকে আরো পরিষ্কার জল পেতে হলে বাড়ির বড়োদের কী করতে দেখো? লক্ষ করলে দেখবে যে বাড়ির বড়োরা ওই জল কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিচ্ছেন। কিন্তু এইভাবে ছেঁকে নেওয়া জলও কি সম্পূর্ণ পরিষ্কার?

কখনোই নয়। তাহলে জলের মতো কোনো তরল ও ওই তরলে গলে না এমন কঠিন পদার্থের মিশ্রণ থেকে দুটো উপাদানকে সম্পূর্ণ আলাদা করতে হলে কী করা দরকার?

— তখনও ছেঁকে তাদের আলাদা করতে হবে। কিন্তু ছাঁকনি হিসাবে এমন জিনিস ব্যবহার করা হবে যার ছিদ্রের মাপ ওই কঠিন কণার মাপের থেকে ছোটো হবে।

এইরকম কাজে ছাঁকনি হিসাবে ব্যবহার করা হয় একরকম কাগজ; যাকে ফিলটার কাগজ বলা হয়। কীভাবে এই কাগজ ব্যবহার করা হয়?

করে দেখো: কিছুটা কাদাগোলা জল নাও। পাশের ছবির মতো প্রথমে একটা গোলাকার ফিলটার কাগজকে চারভাঁজ করো। একটা ভাঁজ খুলে শঙ্কু আকৃতির কাগজটা একটা ফানেলে বসিয়ে তার ওপর কয়েক ফোঁটা জল ছড়িয়ে কাগজটা বসাও। তারপর একটা কাচদণ্ডের সাহায্যে ঘোলা জলটা ফানেলের মধ্যে বসানো ফিলটার কাগজের ওপর ধীরে ধীরে ঢালো।

একটু পর থেকে কী দেখতে পাচ্ছ লেখো:

কী দেখতে পাচ্ছ	কেন হলো বলে মনে হয়

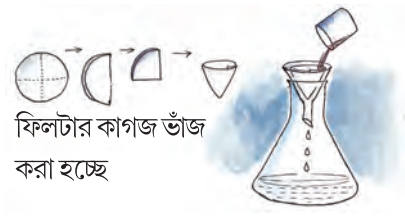

ফিলটার কাগজ ভাঁজ করা হচ্ছে

ওপরের পরীক্ষা থেকে দেখতে পাচ্ছ যে ফিলটার কাগজ সাধারণ কোনো ছাঁকনির (যেমন—কাপড়) থেকে অনেক ভালো কাজ করছে।

এই ফিলটার কাগজটা শুধু তরল পদার্থটাকে (এক্ষেত্রে জল) তার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যেতে দিচ্ছে। কিন্তু কঠিন পদার্থের কণা (এক্ষেত্রে কাদামাটির কণা)— এই কাগজের ওপরে আটকে থাকছে। এইভাবে প্রায় সমস্ত জলটাই কাদা থেকে আলাদা করা যাবে, যা আস্রাবণ পদ্ধতিতে পাওয়া জলের থেকে অনেক বেশি পরিষ্কার।

এইভাবে ফিলটার কাগজের মতো ছাঁকনির সাহায্যে তরল ও কঠিনকে আলাদা করার পদ্ধতিই হলো ফিলটার করা বা পরিস্রাবণ। ফিলটার করার পর পাওয়া নীচের তরলটাকে বলে পরিস্রুত। আর ফিলটার কাগজের ওপর পড়ে থাকা কঠিন পদার্থটা হলো অবশেষ।

ভেবে দেখো

বাড়িতে যে ওয়াটার ফিলটার থাকে, তা কীভাবে কাজ করে? অনেক আগে তো ওয়াটার ফিলটার ছিল না। তখন হাঁড়িতে রাখা বিভিন্ন মাপের নুড়ি ও বালির স্তরের মধ্য দিয়ে জল পাঠিয়ে এই কাজ করা হতো।

জলের মধ্যে কাদা মিশে থাকলে কাদার কণা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু জলের মধ্যে চিনি বা নুন মিশে গেলে চিনি বা নুনকে কী আলাদা করে দেখতে পাও?

— পাও না তাইতো। এর কারণ হলো চিনির বা নুনের কণা আরো ছোটো হয়ে জলে মিশে যায়। এই দুটো ক্ষেত্রে তোমাদের অভিজ্ঞতা থেকে নীচের সারণিটা পূরণ করো:

কোন ক্ষেত্রে	কঠিন কণার মাপ কেমন	আস্রাবণ অথবা পরিস্রাবণ কোন পদ্ধতিতে কঠিন পদার্থকে পৃথক করা সম্ভব
কাদাগোলা জল নুন জল		

কেলাসন

নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারছ যে নুন জল থেকে নুন ও জলকে আলাদা করতে দুটো পদ্ধতির কোনোটার সাহায্যে আলাদা করা সম্ভব নয়। এসো দেখা যাক কোন পদ্ধতিতে নুনজল থেকে নুনকে ফিরে পাওয়া যায়।

করে দেখো

ওপরের ছবির মতো একটি পাত্রে কিছুটা নুনজল নাও। তারপর ওই নুনজলকে ফোটাতে থাকো। যত সময় যাবে দেখবে নুনজলের জল ফুটতে ফুটতে বাষ্প হয়ে ক্রমশ কমে যাচ্ছে। আর নুনজলের দ্রবণ গাঢ় হচ্ছে। নুনজল বেশ গাঢ় হয়ে এলে না নাড়িয়ে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করতে দাও। অনেকক্ষণ এইভাবে রাখলে তুমি কী দেখতে পাবে?

— বেশ কিছুটা নুন ওই নুনজলের মিশ্রণ থেকে দানা দানা আকারে আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

এই দানা দানা নুনকে কী বলে?

—এইরকম দানা দানা চকচকে নুনের দানাকে বলে নুনের কেলাস। এইভাবে দ্রবণ থেকে কঠিন পদার্থের কেলাস তৈরির পদ্ধতিকে কী বলে?

এই পদ্ধতিকে কেলাসন বলে। (এই পদ্ধতিতে কোনো কোনো পদার্থের দ্রবণ থেকে কঠিন দ্রাব-কে পৃথক করা যায়।)

চুম্বকের সাহায্যে মিশ্র পদার্থের পৃথককরণ

তোমরা লক্ষ করে থাকবে চালের সঙ্গে অনেক সময়েই বিভিন্ন জিনিস মিশে থাকে। চালের মধ্যে খুঁজলেই কাঁকর, বালি, ধানের খোসা, কালো চাল—এরকম নানা জিনিস খুঁজে পাবে। এগুলো না হয় হাত দিয়ে তুলে নিয়ে আলাদা করা যায়। কুলোয় করে ঝেড়েও চালের মধ্যে থাকা হালকা জিনিসগুলো কিছুটা উড়িয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু কোনো জিনিসে যদি লোহার গুঁড়ো মিশে থাকে, তখন কী করবে? লোহাকে আকর্ষণ করতে পারে এমন জিনিস তোমাদের হাতের কাছেই আছে। ছোটো বড়ো স্পিকারের পিছনদিকে দেখবে চুম্বক লাগানো থাকে। এই কাজে এরকম একটা চুম্বক ব্যবহার করলেই হলো।

করে দেখো

খারাপ হয়ে যাওয়া স্পিকার থেকে একটা চুম্বক খুলে নাও। অন্য চুম্বকও নিতে পারো। একটা কাগজের উপর নুন ও লোহার গুঁড়ো মিশিয়ে নাও। তারপর ছবির মতো করে নুন ও লোহার গুঁড়োর মিশ্রণের উপর চুম্বকটা ধরে দেখত কী হয়? যা দেখলে তা নীচে লেখো।

কী দেখতে পেলে	আর কী কী মিশ্রণ চুম্বক দিয়ে আলাদা করা যাবে

4 শিলা ও খনিজ পদার্থ

নানান ধরনের শিলা

আগ্নেয়শিলা

তোমরা কী রেললাইনের কালো পাথর কিংবা পিচের রাস্তা তৈরির পাথর দেখেছ? আগ্নেয়গিরি থেকে উঠে আসা লাভা শক্ত হয়ে এগুলো তৈরি। এখন আমরা দেখি পৃথিবীর ওপর পিঠটা শক্ত মাটি আর পাথরের তৈরি। কিন্তু পৃথিবীর সৃষ্টির পরেই এরকম ছিল কী? মনে করা হয় তখন পুরোটাই ছিল খুব গরম আর গলে যাওয়া পাথর দিয়ে তৈরি। আস্তে আস্তে পৃথিবী যত ঠান্ডা হতে থাকল ওপরের অংশটা ততই জমাট বাঁধতে লাগল। এই করেই পৃথিবীর ওপরের শক্ত খোলাটা তৈরি হয়েছে। মাটির যত গভীরে যাওয়া যায় চাপ এবং উষ্ণতা তত বাড়ে। পৃথিবীর গভীরের চাপ আর উষ্ণতা এতই বেশি যে সেখানে পাথর থাকে তরল অবস্থায়। একে বলে ম্যাগমা (Magma)। এই ম্যাগমা যখন কোনো পাথরের ফাটল বা, পাহাড়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে তখন তাকে বলে লাভা (Lava)। বাইরে এসে লাভা জমে শক্ত হয়। এই জমাট-বাঁধা লাভাই হলো আগ্নেয়শিলা।

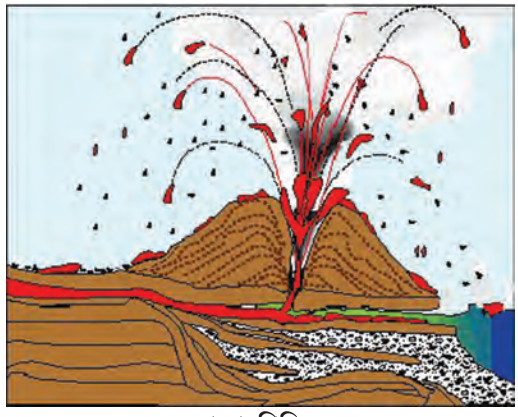

আগ্নেয়গিরি

তিন রকমের আগ্নেয়শিলা হলো—ব্যাসাল্ট, গ্রানাইট আর পিউমিস। রেললাইনের কালো পাথরগুলো হলো ব্যাসাল্টের টুকরো। পিউমিসকে বলে ঝামা পাথর। উত্তপ্ত ম্যাগমার উপরে ফেনার মতো অংশ তাড়াতাড়ি জমে গিয়ে পিউমিস তৈরি হয়। পিউমিস পাথরে অনেক ছিদ্র দেখা যায়, গ্রানাইটে তো তা দেখা যায় না। কেন? তরল ম্যাগমায় দ্রবীভূত গ্যাস ম্যাগমার মধ্যে দিয়ে বেরোবার সময় পিউমিস পাথরে ওই ছিদ্র সৃষ্টি হয়।

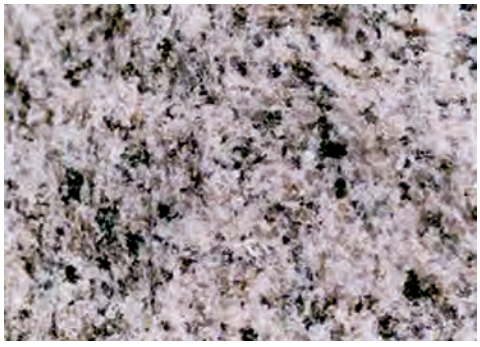

গ্রানাইট

ব্যাসাল্ট

পিউমিস

পাললিক শিলা

হ্রদ, নদী, সমুদ্রের জলের নীচে পলি জমা হয়। ধীরে ধীরে সেই পলিস্তর মাটির নীচে চলে যেতে থাকে। মাটির নীচে গরমে আর চাপে লক্ষ লক্ষ বছরে সেই পলি থেকে পাললিক শিলা তৈরি হয়। জলের নীচে পাললিক শিলা তৈরি হয় তাই অনেক সময়েই এতে মাছ, শামুক ইত্যাদির পাথর হয়ে যাওয়া দেহাবশেষ (ফসিল) পাওয়া যায়। তিন ধরনের পাললিক শিলার উদাহরণ দেওয়া হলো— বেলে পাথর, শেল ও চুনাপাথর।

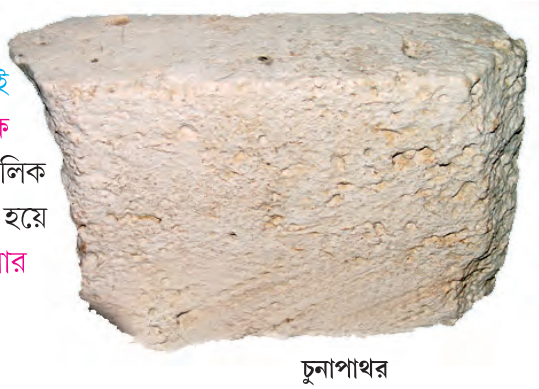

চুনাপাথর

শেল

বেলেপাথর

পরিবর্তিত শিলা

আগ্নেয়শিলা এবং পাললিক শিলা মাটির গভীরে গরমে আর চাপে বদলে গিয়ে পরিবর্তিত শিলা তৈরি করে। পৃথিবীর ওপরের পিঠের বেশিরভাগটাই আগ্নেয় ও পরিবর্তিত শিলা দিয়ে তৈরি। মার্বেল পাথর একরকমের পরিবর্তিত শিলা যা চুনাপাথরের পরিবর্তনে তৈরি হয়। শেলের পরিবর্তনে তৈরি হয় স্লেট, গ্রানাইটের পরিবর্তনে তৈরি হয় নীস।

স্লেট

মার্বেল পাথর

নীস্

খনিজ পদার্থ ও আকরিক

তোমরা তৃতীয় অধ্যায়ে ধাতুদের কয়েকটি ভৌত ধর্মের কথা জেনেছ। এবার তোমাদের চেনা ছটি ধাতুর নাম দেওয়া হলো। এ দিয়ে তৈরি হয় এমন জিনিসের নাম লেখো। প্রয়োজনে শিক্ষক মহাশয়ের সাহায্য নাও।

ধাতুর নাম	ধাতুটি দিয়ে তৈরি হয় এমন জিনিসের নাম
লোহা	
তামা	
অ্যালুমিনিয়াম	
দস্তা	
রুপো	
সোনা	

এত সব ধাতু প্রকৃতিতে কীভাবে পাওয়া যায়— মৌল অবস্থায় না যৌগ অবস্থায়?

তোমরা হয়তো লক্ষ করেছ কিছু কিছু ধাতুর তৈরি জিনিস খোলা হাওয়ায়, রোদে-জলে পড়ে থাকতে থাকতে নষ্ট হয়ে যায়। তোমরা দেখেছ জল লাগতে লাগতে চকচকে লোহার জিনিসে কীরকম লালচে রঙের মরচে পড়ে। তোমরা হয়তো দেখেছ পুরোনো তামার বাসনপত্রে কেমন সবুজ ছোপ ধরে। এর মানে কী? এর মানে হলো এরা খোলা হাওয়ায় নানান বিক্রিয়া করে নতুন যৌগ তৈরি করে। এই উদাহরণগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এদের প্রকৃতিতে যৌগ হিসাবে পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। একই কথা অ্যালুমিনিয়াম, দস্তার বেলাতেও প্রযোজ্য। সোনার আংটি কিন্তু জল লাগলে বা খোলা হাওয়ায় পড়ে থাকলে কোনো পরিবর্তন হতে দেখা যায় না। সেই কারণে প্রকৃতিতে সোনাকে মৌল অবস্থায় পাওয়া যায়।

প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধাতুর নানান যৌগ বালি-মাটি ইত্যাদির সঙ্গে মিশে থাকা অবস্থায় পাওয়া যায়। এদের ধাতুর খনিজ বা 'মিনার‍্যাল' (Mineral) বলে। খনিজ থেকে ধাতুকে আলাদা করে নেবার পদ্ধতিকে বলে ধাতু নিষ্কাশন। যে খনিজ থেকে ধাতুকে সস্তায় ও সহজে বার করা সম্ভব তাকে ধাতুর আকরিক বা 'ওর' (Ore) বলা হয়।

নিজেরা আলোচনা করো, প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও :

- "কোনো ধাতুর একাধিক খনিজ থাকলেও তার সবগুলোই আকরিক নাও হতে পারে" — ঠিক কিনা বিচার করো।

আমরা এবার খুব প্রয়োজনীয় তিনটি ধাতুর নাম আর আকরিক সম্বন্ধে কিছু কথা জেনে নেব:

ধাতুর নাম	ধাতুর প্রধান আকরিক	আকরিকে ধাতুর যৌগে প্রধানত কি কি মৌল থাকে
লোহা	হেমাটাইট	লোহা, অক্সিজেন
অ্যালুমিনিয়াম	বক্সাইট	অ্যালুমিনিয়াম, অক্সিজেন
তামা	কপার গ্লান্স	তামা, সালফার

নীচে তোমাদের তিনটি ধাতুর আকরিক ও ধাতুর নমুনার ছবি দেখানো হলো। লক্ষ করো আকরিক থেকে নিষ্কাশিত ধাতুকে আকরিকের মতো দেখতে নয়। এ থেকে বোঝা যায় ধাতু নিষ্কাশন একটি রাসায়নিক পরিবর্তন । নীচে ☐ এর মধ্যে ধাতুর নাম লেখো।

লোহার আকরিক হেমাটাইট

→

☐

অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক বক্সাইট

→

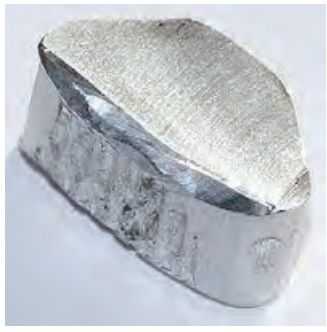

☐

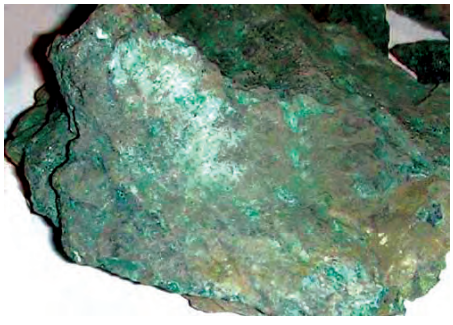

তামার আকরিক কপার গ্লান্স

→

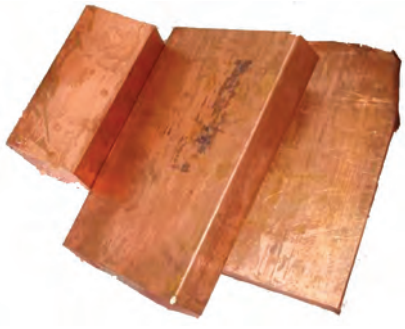

☐

সংকর ধাতু

তোমরা নিশ্চয়ই কাঁসার থালা, পিতলের ঘন্টা বা মূর্তি দেখেছ। কাঁসা বা পিতল এরা একটা ধাতু নয়। এরা হলো মিশ্র ধাতু। ইতিহাসে তোমরা যে ব্রোঞ্জ ধাতুর কথা জেনেছ সে হলো তামা আর টিন মিশিয়ে তৈরি । পিতল তৈরি হয় তামা আর দস্তা মিশিয়ে।

তোমাকে কিছু শব্দ দেওয়া হলো। এগুলো ঠিকঠাকভাবে ব্যবহার করে তোমায় নীচের গল্প দুটো সম্পূর্ণ করতে হবে: শব্দভাণ্ডার— শক্ত/ভার/কমে যায়।

- লোহা আর সামান্য কার্বন মিশিয়ে ইস্পাত (স্টিল) তৈরি করা হয়। লোহা দিয়ে ব্রিজ তৈরি হলে তা গাড়ি চলাচলে ভেঙেই পড়ত। ইস্পাত দিয়ে তৈরি ব্রিজ কিন্তু সহজে ভেঙে পড়ে না। এর মানে হলো ইস্পাত লোহার চেয়ে ..... এবং অনেক ..... সহ্য করতে পারে।
- লোহার সঙ্গে ক্রোমিয়াম মিশিয়ে স্টেইনলেস স্টিল তৈরি হয়। লোহার কড়ায় মরচে পড়ে, স্টেইনলেস স্টিলের গ্লাসে কিন্তু মরচে পড়ে না। তাহলে ক্রোমিয়ামের সঙ্গে থাকলে লোহার রাসায়নিক বিক্রিয়া করার ক্ষমতা কিছুটা .....।

এবার কি আমরা মিশ্র ধাতুদের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারছি? মিশ্র ধাতুদের এমন সব গুণাগুণ আছে যা একটা ধাতুর নেই।

কোনো ধাতুর সঙ্গে অন্য ধাতু বা অধাতু বিশেষ মাত্রায় মিশিয়ে গলিয়ে নেওয়া হয়। তরল মিশ্রণ ঠান্ডা হলে সংকর ধাতু পাওয়া যায়। তোমাদের চেনা আরো কয়েকটি সংকর ধাতু হলো গয়নার সোনা, ইলেকট্রিকের ফিউজের তারের ধাতু আর ধাতুর জিনিস জোড়া দেওয়ার 'রাংঝাল'।

জীবাশ্ম বা ফসিল

ছবিগুলো কীসের বলতে পারো? পাথরের মধ্যে প্রথমটা হলো একরকম সামুদ্রিক শামুকের খোলা, দ্বিতীয়টা একটা মাছের দেহাবশেষ। তৃতীয় ছবিতে একটা সাপের দেহাবশেষ দেখা যাচ্ছে।

এরা পাথরের মধ্যে এল কী করে?

আজ থেকে অনেক কোটি বছর আগে এই শামুক, মাছ আর সাপ এরা সবাই বেঁচেছিল। তারপরে একদিন এরা মারা গেল । মাটিতে বা জলের নীচে পড়ে থাকতে থাকতে এদের দেহাবশেষে নানান পরিবর্তন ঘটতে লাগল। প্রথমে দেহের নরম অংশগুলো নষ্ট হয়ে গেল। তারপর সেই পড়ে থাকা অংশের উপর ধীরে ধীরে জমতে লাগল আরো পলি। মাটির নীচে কোটি কোটি বছর ধরে নানান পরিবর্তন ঘটে এইসব দেহাবশেষ একসময় পাথরে পরিণত হলো । এই পাথুরে দেহাবশেষগুলো হলো জীবাশ্ম বা ফসিল (Fossil)। 'অশ্ম' মানে পাথর। তবে সব ফসিলই পাথুরে দেহাবশেষ নয়। লুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাণীর পায়ের ছাপকেও ফসিল বলা হয়। গাছের জমাট বাঁধা রজনের মধ্যে আটকে পড়া পোকার দেহকেও আমরা ফসিল বলব।

ওপরে তোমরা যেসব প্রাণীদের ফসিলের ছবি দেখলে তারা কেউ এখন বেঁচে নেই, বহু আগেই তারা পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে। কিন্তু ফসিল দেখেই বিজ্ঞানীরা তাদের নানান কথা জানতে পারেন।

কী করে ফসিল তৈরি হয়

আমাদের চেনা আরো এক রকমের ফসিল

● পাশের ওই কালো পাথরের মতো জিনিসটা কী বলে মনে হয় ?.....

● ওর মধ্যে কিসের ছাপ দেখতে পাচ্ছ?.....

পাশের ছবিটা হল একটা কয়লার টুকরোয় গাছের পাতার ছাপ। এগুলো কোটি কোটি বছর আগের কিছু গাছের পাতার ফসিল। তখনকার পৃথিবীর চেহারাটা কিন্তু মোটেই আজকের মতো ছিল না। পৃথিবীতে তখন এমন অনেক গাছ জন্মাত যাদের অনেকেই আজ লোপ পেয়েছে। অগভীর জলা জায়গায় জন্মানো সেই সব গাছ এক সময় মাটির নীচের নড়াচড়ায় উপড়ে গেল। তারপর একসময় তারা মাটির নীচে চলে গেলো। তাদের উপর ক্রমশ জমতে লাগল আরো কাদা আর মাটি। কোটি কোটি বছর ধরে মাটির নীচের চাপে আর গরমে থাকতে থাকতে পাতার যৌগগুলোর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটল। তৈরি হলো কয়লা আর কয়লার মধ্যে রয়ে গেলো পাতাগুলোর ছাপ।

জীবাশ্ম জ্বালানি বা ফসিল ফুয়েল

যা জ্বালিয়ে বা পুড়িয়ে আমরা তাপ পাই তাই হলো জ্বালানি (Fuel)। নানা রকম জ্বালানির মধ্যে কিছু জ্বালানি আছে যাদের সম্প্রতি পাওয়া গেছে। যেমন ধরো কাঠ, খড়, কাগজ, গোবর ইত্যাদি। এদের কী তুমি ফসিল বলবে? এরা কী লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তৈরি হয়েছে? নিশ্চয়ই নয়। আবার দেখো, আরেক রকমের জ্বালানি হল কয়লা, পেট্রোলিয়াম আর প্রাকৃতিক গ্যাস। নানা ধরনের জীবের দেহাবশেষ থেকেই এগুলো তৈরি হয়েছে। জীবের দেহাবশেষ কিন্তু একশো-দুশো বছরেই জ্বালানিতে বদলে যায়নি, অনেক অনেক কোটি বছর সময় লেগেছে। সেই কারণে কয়লা, পেট্রোলিয়াম আর প্রাকৃতিক গ্যাসকে বলে জীবাশ্ম জ্বালানি বা ফসিল ফুয়েল।

কী করে পেট্রোলিয়াম আর প্রাকৃতিক গ্যাস তৈরি হয়

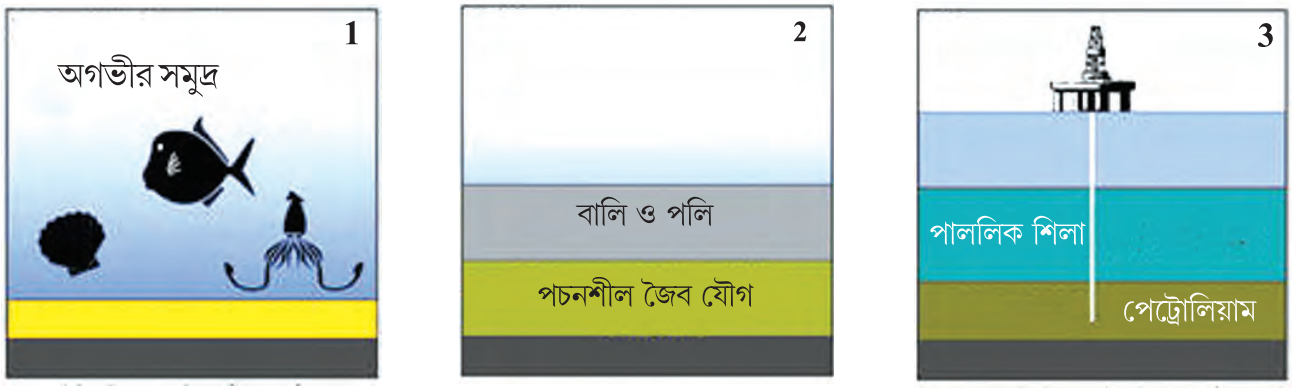

ছবি দেখে আর নীচের শব্দগুলো ঠিকঠাক ব্যবহার করে পেট্রোলিয়াম তৈরির পদ্ধতি বুঝতে পারো কিনা দেখো ঃ

শব্দভাণ্ডার : জীবের/চাপে/পলি/পাললিক

প্রথম ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে অগভীর সমুদ্রে জলের নীচে..... মৃতদেহ এসে জমা হলো। দ্বিতীয় ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে তার উপর ..... এসে জমা হচ্ছে। কোটি কোটি বছর ধরে মাটির নীচের গরমে আর ..... পলি বদলে গিয়ে ..... শিলা তৈরি হলো। জীবের দেহাবশেষের নানান পরিবর্তন ঘটে তৈরি হলো পেট্রোলিয়াম আর প্রাকৃতিক গ্যাস।

ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার

কয়লার ব্যবহার

(ক) জ্বালানি হিসেবে

তোমরা কী কয়লার উনুনে রান্না হতে দেখেছ? জামাকাপড় ইস্ত্রি করার দোকানে কিংবা চায়ের দোকানের উনুনগুলোই বা কীসে জ্বলে? —কয়লায়, তাইতো? কয়লা হলো মানুষের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত জীবাশ্ম জ্বালানি। এখন কিন্তু কয়লার প্রধান ব্যবহার বিদ্যুৎ তৈরিতে। কি করে জানো? তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা পুড়িয়ে তাপ পাওয়া যায়। সেই তাপ কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি হয়।

(খ) রাসায়নিক পদার্থ তৈরিতে

বাতাসের অনুপস্থিতিতে কয়লাকে বেশি উষ্ণতায় গরম করা হলে কঠিন অবশেষ, তরল আর গ্যাস পাওয়া যায়। এই কঠিন অবশেষ ধাতু নিষ্কাশনের কাজে লাগে। তরলের মধ্যে প্রধান হল আলকাতরা । এ থেকে বহু দরকারি জৈব যৌগ আলাদা করা হয়। গ্যাস মিশ্রণকে শোধন করে নিয়ে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার

1.

2.

3.

4.

ওপরের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা জ্বালানি ব্যবহৃত হয়। তুমি কি বলতে পারো কোনটায় কি জ্বালানি লাগে?

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

এই যে চার রকম জ্বালানি এরা হলো যথাক্রমে কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল আর এল.পি.জি.। এরা এল কোথা থেকে? পেট্রোলিয়াম শোধন করার সময় আমরা এদের পাই।

পেট্রোলিয়াম কী আর কেনই বা তাকে শোধন করা দরকার

পেট্রোলিয়াম হলো চটচটে তরল একটা মিশ্রণ। এতে বহুরকমের যৌগ, জল, মাটি ইত্যাদি মিশে থাকে। একে সরাসরি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। জল মাটি ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থ দূর করার পর তবেই পেট্রোলিয়াম থেকে নানান জ্বালানি পাওয়া যায়। একে বলে পেট্রোলিয়াম শোধন করা। পেট্রোলিয়াম শোধনের সময় প্রোপেন ও বিউটেন গ্যাসীয় জ্বালানি পাওয়া যায়। আমরা যে রান্নার গ্যাসের এল.পি.জি. (লিকুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস) সিলিন্ডার দেখি তাতে প্রধানত তরল প্রোপেন থাকে। জ্বালানি ছাড়াও পেট্রোলিয়ামজাত যৌগ থেকে নানা ধরনের প্লাস্টিক, দ্রাবক, ঘর্ষণ কমাবার তেল, রং ইত্যাদি বহু জিনিস তৈরি করা হয়।

প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার

সাধারণত তরল পেট্রোলিয়ামের উপরেই থাকে প্রাকৃতিক গ্যাস। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান হলো মিথেন। শোধিত প্রাকৃতিক গ্যাসকে বেশি চাপে সিলিন্ডারে ভরে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। একেই বলা হয় কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস বা সি.এন.জি.। সি.এন.জি. দিয়ে এখন অনেক জায়গায় বাসও চালানো হচ্ছে। এতে দূষণের পরিমাণ ডিজেলচালিত বাসের চেয়ে কম।

সি. এন. জি. দিয়ে চালিত বাস

5 মাপজোক বা পরিমাপ

দৈনন্দিন জীবনে পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা ও পরিমাপের একক সমূহ

পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো।

(1) তোমার উচ্চতা কত?

(2) তোমার ওজন কত?

(3) তোমার জন্য একটা চুড়িদার বা জামা বানাতে কতটা কাপড় লাগে?

(4) তোমার বাড়িতে মাসে কতটা চাল লাগে?

(5) তোমার পড়ার ঘরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা কত?

(6) তোমার স্কুল কটা থেকে শুরু হয়?

(7) কারো জ্বর হয়েছে কিনা তুমি কীভাবে তা বোঝ?

ওপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে তোমাকে যা যা করতে হবে তাকে আমরা বলি পরিমাপ।

তাহলে বুঝলে তো আমাদের প্রতিদিনের জীবনে **পরিমাপের গুরুত্ব** কতটা।

এবার নীচের ছবিগুলো মন দিয়ে দেখো ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো।

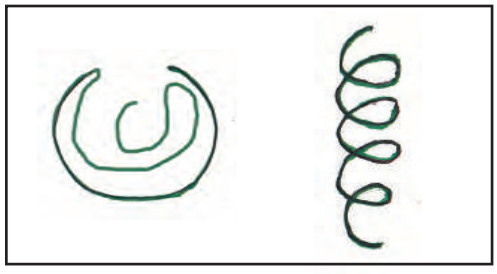

(1) কোনটা দৈর্ঘ্যে বড়ো ?

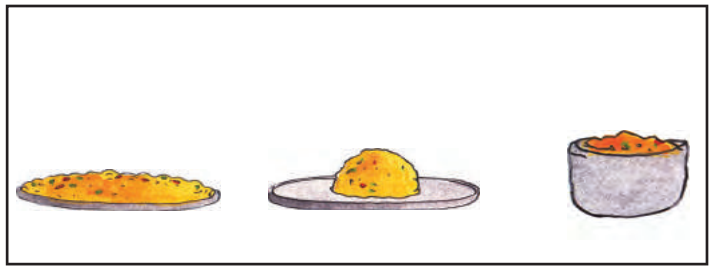

(2) কোন পাত্রে রাখা ভাত সবচেয়ে বেশি আছে?

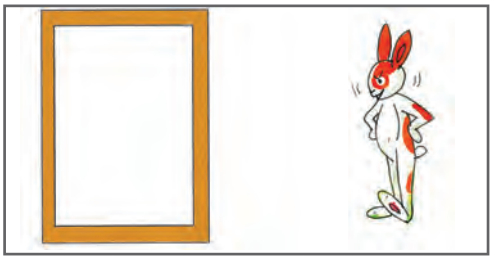

(3) A ছবিটি কি B ফোটোফ্রেমে লম্বালম্বি ভাবে বাঁধানো যাবে?

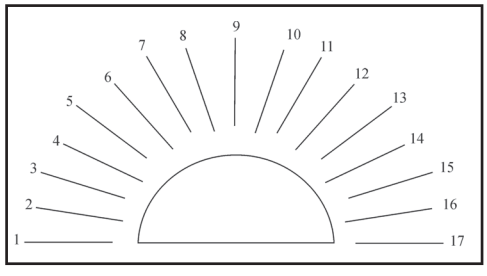

(4) 1 থেকে 17 প্রতিটি সরলরেখাংশের দৈর্ঘ্য কি সমান?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর ঠিকভাবে দিতে কি তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে ?

অসুবিধা দূর করতে তোমাকে কী কী বিষয় জানতে হবে?

তাহলে দেখা গেল, **পরিমাপ না করে** শুধু চোখে দেখে প্রশ্নগুলি উত্তর করা সম্ভব নয়।

নীচের সারণিটি পূরণ করো এবং কাজটি করতে কত সময় লাগল লেখো।

কী মাপলে	কী দিয়ে মাপলে
আমার বিজ্ঞান বই-এর **দৈর্ঘ্য** **চওড়া বা প্রস্থ** **ভর** (যাকে আমরা সাধারণত ওজন বলে থাকি)	.... **দাঁড়িপাল্লা বা তুলাদণ্ড**
টেবিলটা পূরণ করতে আমার সময় লেগেছে .....।	

তুমি তোমার বিজ্ঞান বই-এর যা যা পরিমাপ করলে সেগুলোকে বলে ভৌত বা প্রাকৃতিক রাশি। আর এই রাশিগুলো মাপতে লাগে কিছু না কিছু **যন্ত্র**। যা পরিমাপ করা যায় তাকেই বলা হয় **ভৌত রাশি বা প্রাকৃতিক রাশি**।

তুমি তোমার জ্যামিতি বাক্সটিকে নানাভাবে পরিমাপ করে উপরের মতো সারণি আকারে লেখো।

এবার পাশের **আয়তটিকে** নানাভাবে পরিমাপ করে নীচের সারণিতে লেখো।

রাশি	মান	একক
দৈর্ঘ্য		
প্রস্থ		
ক্ষেত্রফল= দৈর্ঘ্য × প্রস্থ		বর্গসেমি

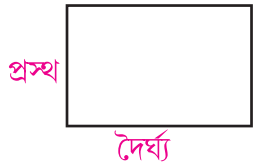

ছবিতে দেওয়া এই আকারটিকে **আয়ত** বলা হয়।

পাশের সারণির কোন রাশিটিকে মাপার সময় তোমাকে অন্য রাশির সাহায্য নিতে হলো বা একই রাশিকে একাধিকবার ব্যবহার করতে হলো?

ওই রাশিটা মাপতে তুমি অন্য কতগুলো রাশির সাহায্য নিলে আর সেগুলি কী কী? বা, একই রাশিকে কতবার ব্যবহার করলে?

এরকম আর কয়েকটা রাশির নাম নীচে দেওয়া হলো।

আয়তন = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা

বেগ = দৈর্ঘ্য ÷ সময়

ঘনত্ব = ভর ÷ আয়তন

তাহলে বোঝা গেল, এমন কিছু রাশি আছে যারা **অন্য কোনো রাশির উপর নির্ভর করে** না। যেমন , দৈর্ঘ্য, ভর, সময় ইত্যাদি। এদের **মৌলিক বা প্রাথমিক রাশি বলে।**

আবার, এমন কিছু রাশি আছে যাদের **একাধিক মৌলিক রাশি** নিয়ে তৈরি করা হয়। যেমন, ক্ষেত্রফল, ঘনত্ব, আয়তন, বেগ ইত্যাদি। এদের **লব্ধ রাশি** বলে।

ওপরের সারণিতে লেখা রাশিগুলির পরিমাপ লেখার সময় তুমি কি কেবল সংখ্যাই লিখেছিলে, নাকি তার সঙ্গে অন্য কিছুও লিখেছ? যেমন, সেন্টিমিটার, মিটার, ফুট, ইঞ্চি, হাত, বিঘত, গ্রাম, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড, মিনিট — এরকম কিছু শব্দও লিখেছ কি? সংখ্যার পাশে লেখা ওই শব্দগুলিকে আমরা বলি একক। একক ছাড়া পরিমাপের কোনো অর্থ হয় না।

প্রাথমিক রাশির একক হলো প্রাথমিক একক এবং লব্ধ রাশির একক হলো লব্ধ একক। যেমন সময় একটি প্রাথমিক রাশি। এতএব সময়ের একক 'সেকেন্ড' হলো প্রাথমিক একক। আবার বেগ একটি লব্ধ রাশি। তাই বেগের একক 'মিটার/সেকেন্ড' একটি লব্ধ একক।

দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল, আয়তন, ভর ও সময়

দৈর্ঘ্যের পরিমাপ

(1) তোমাকে একটা ঘড়ি, একটা স্কেল আর কয়েকটি বাটখারা দেওয়া হলো। এবার বলা হলো একটা আলমারির উচ্চতা মাপতে।

তুমি কোন জিনিসটা ব্যবহার করবে? এবার একটু ভেবে দেখো তো বাকিগুলি তুমি ব্যবহার করলে না কেন?

তাহলে দেখা গেল, দৈর্ঘ্য রাশিটাকে পরিমাপের জন্য দৈর্ঘ্য-ই প্রয়োজন হয়, ভর বা সময় বা অন্য কোনো রাশি নয়।

তেমন সময়কে সময় দিয়েই, ভর-কে ভর দিয়েই মাপতে হয়।

অর্থাৎ কোনো রাশিকে পরিমাপ করতে সেই রাশিরই একটা সুবিধাজনক অংশ দিয়ে পরিমাপ করতে হয়। ওই সুবিধাজনক অংশটা হলো ওই **রাশির একক**।

বিজ্ঞানের স্যার রাতুল, রুদ্র আর ইকবালকে বললেন — 'একটা বেঞ্চকে **বিঘত** মেপে তা কতটা লম্বা প্রত্যেকে আলাদা করে আমায় জানাও।"

ভেবে বলো তো তিনজনের মাপ কি সমান হবে? না হলে কেন? আবার ধরো, একজন বেশ **'লম্বা'**, আর একজন বেশ **'বেঁটে'** মানুষকে একটা শাড়ি ক-হাত লম্বা, মেপে বলতে বলা হলো।

দুজনের মাপ কি সমান হবে? যদি না হয় তবে কেন?

তবে দেখা যাচ্ছে যে বিঘত বা **'হাত'** বা **'পায়ের পাতা'** ইত্যাদিকে দৈর্ঘ্যের একক (অর্থাৎ 'এক') ধরে একই বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপের সময় একেক জনের ক্ষেত্রে একেক পরিমাপ পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে গ্রিসে দৈর্ঘ্যের একক হিসাবে **বিঘত**-কে ব্যবহার করা হতো। আবার মিশরে দৈর্ঘ্যের একক হিসাবে ব্যবহৃত হতো **Cubit** বা **হাত**। তাহলে দেখো, দৈর্ঘ্যের পরিমাপ এক এক জায়গায় এক এক রকম ছিল।

বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, এইসব অসুবিধা দূর করতে এমন একক নিতে হবে যাকে পৃথিবীর সবাই নির্দ্বিধায় **'প্রমাণ'** বা Standard বলে মেনে নেবে। ব্যক্তি বা স্থানভেদে তা কখনও আলাদা হবে না।

পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতির জটিলতা এড়াতে 1960 সালে তৈরি করা হয় SI **একক**।

SI **পদ্ধতিতে** সাতটা প্রাথমিক একক।

রাশি	একক
দৈর্ঘ্য	মিটার (m)
ভর	কিলোগ্রাম (kg)
সময়	সেকেন্ড (s)
তড়িৎ প্রবাহ	অ্যাম্পিয়ার (A)
আলোর তীব্রতা	ক্যান্ডেলা (cd)
অণু-পরমাণুর পরিমান	মোল (mol)
উষ্ণতা	কেলভিন (K)

কোনো রাশিকে পরিমাপ করতে ওই রাশিরই একটা সুবিধাজনক অংশকে আন্তর্জাতিকভাবে **প্রমাণ বা Standard** বলে ধরে নেওয়া হয় — ওই প্রমাণ বলে গৃহীত অংশই ওই রাশির একক। কোনো রাশি তার এককের কতগুণ, তা হিসাব করে, ওই রাশিকে মাপা হয়।

যেমন, 25 মিটার লম্বা পুকুর মানে — পুকুরটার দৈর্ঘ্য হলো দৈর্ঘ্যের প্রমাণ SI একক 1 মিটারের 25 গুণ।

হাতেকলমে

তুমি একটি মিটার-স্কেল দিয়ে মেপে 1 মিটার লম্বা একটা সুতো নাও। এখন নীচের AB সরলরেখাংশের দৈর্ঘ্য ওই সুতো দিয়ে মাপো।

তোমার কি মনে হচ্ছে ওই মাপ নেওয়ার জন্য সুতোটা একটু বেশি বড়ো ?

এবার সুতোটাকে সমান দশ অংশে কেটে ফেলো ও তা থেকে একটি অংশ নিয়ে AB দৈর্ঘ্যটিকে মাপো। এবার মাপতে কি সুবিধা হলো? অতএব, দেখা গেল, AB $= \frac{1}{10}$ মিটার অর্থাৎ 1 মিটারের 10 ভাগের 1 ভাগ। এটাকে আমরা 1 ডেসিমিটার বলে থাকি। এভাবে 10 দিয়ে ভাগ করে করে আমরা SI পদ্ধতির ছোটো মানের রাশির একক পাই। একে বলে Sub-multiple unit বা উপগুণিতক একক।

এবার ওই 1 মিটারের সুতো দিয়ে যদি তোমায় তোমার বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব বা দুটো রেল স্টেশনের মধ্যে দূরত্ব মাপতে বলা হয়, তখন কি কাজটা তোমার কাছে সহজ হবে। তোমার কি মনে হচ্ছে ওই দূরত্ব মাপার জন্য 1মিটারের সুতোটা খুবই ছোটো?

এভাবে কলকাতা থেকে দিল্লির দূরত্ব = 1305000 মিটার হয়।

এক্ষেত্রে ওই দূরত্বটা লেখা যায় 1305 × 1000 m = 1305 km.

অর্থাৎ 1 মিটারের 1000 গুণ = 1 কিলোমিটার।

জেনে রাখো

10 mm	=	1 cm
10 cm	=	1 dm
10 dm	=	1 m

টেবিল 1

জেনে রাখো

100 cm	=	1 m
1000 m	=	1 km

টেবিল 2

- **আন্তর্জাতিক প্রমাণ মিটার কাকে ধরা হয়?**

1889 সালে ফ্রান্সের প্যারি শহরে 'ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো অফ ওয়েটস অ্যান্ড মেজার্স' নামক সংস্থায় 0^0C- তাপমাত্রায় রাখা প্লাটিনাম (90 %) ও ইরিডিয়াম (10 %) - এর সংকর ধাতুর তৈরি একটা দণ্ডের দু-প্রান্তের দুটি নির্দিষ্ট দাগের মাঝের দূরত্বকে সারা বিশ্বে **প্রমাণ বা** Standard 1 **মিটার ধরা হয়**।

এই প্রমাণ 1 মিটার থেকে তার গুণিতক ও উপগুণিতক এককগুলি তৈরি করা হয়। এভাবে 10 দিয়ে গুণ করে আমরা SI পদ্ধতির বড়ো একক পেতে পারি। একে বলে **গুণিতক একক বা** Multiple unit। উপরের টেবিল 1 এ SI পদ্ধতিতে দূরত্ব মাপার বড়ো থেকে ক্রমশ ছোটো উপগুণিতক এককগুলো (Submultiple Unit) লক্ষ করো। ওপর থেকে পরপর প্রথমটার 10

গুণ হলো দ্বিতীয়টা। আবার, নীচ থেকে ওপরে পরপর প্রথমটার $\frac{1}{10}$ গুণ হলো দ্বিতীয়টা।

ভালো ভাবে লক্ষ করো :

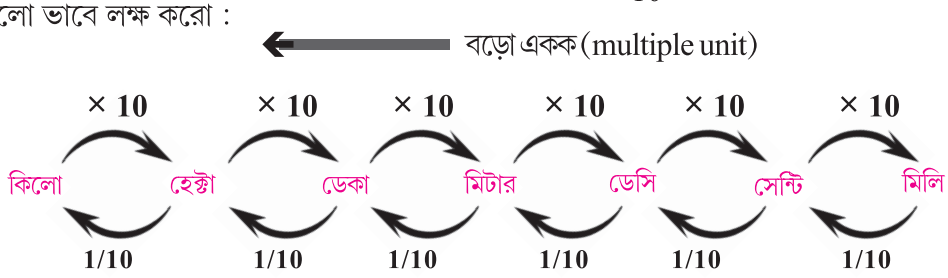

একক	চিহ্ন
কিলোমিটার	km
হেক্টোমিটার	hm
ডেকামিটার	dam
মিটার	m
ডেসিমিটার	dm
সেন্টিমিটার	cm
মিলিমিটার	mm

1 km = 1 × 10 hm = 10 hm

= 100 dam

= .....? cm

আবার, 1 m = $\frac{1}{10}$ da m = 0.1 dam

= $\frac{1}{1000}$ km = 0.001 km

= ..... ? hm

এই পদ্ধতির সুবিধা হলো এই পদ্ধতিতে একদিকে যেমন খুব ক্ষুদ্র মানের রাশি অন্যদিকে অনেক বড়ো মানের রাশিকেও মাপা যায়।

যেমন — একটা সরু তারের ব্যাস মাপা যায় মিলিমিটারে, আবার কলকাতা থেকে দিল্লির দূরত্ব মাপা যায় কিলোমিটার -এ।

হাতেকলমে

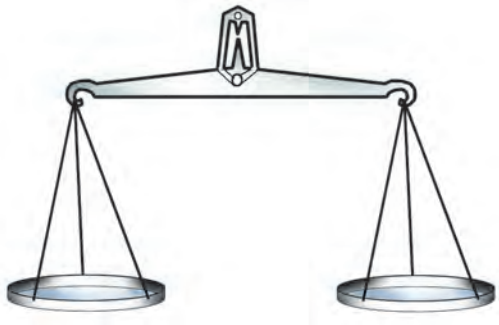

তুমি দোকানদারকে 1 কেজি ডাল দিতে বললে। দোকানদার **দাঁড়িপাল্লা** দিয়ে ডাল মেপে তোমায় দিল।

এখানে যে রাশিটার পরিমাপ করা হলো তার নাম কী?

মনে করে দেখো SI পদ্ধতিতে কোন রাশির একক কিলোগ্রাম। ওই রাশি মাপার জন্য দোকানদার যে যন্ত্র ব্যবহার করল সেটা হলো **দাঁড়িপাল্লা**। ভর মাপার এই যন্ত্রের আর একটা নাম হলো **সাধারণ তুলা যন্ত্র**।

তুলা যন্ত্রের এক পাত্রে বাটখারা রাখা হয়, অপর পাত্রে থাকে বস্তু। পরিমাপ ঠিক হলে সূচক সাম্যাবস্থায় আসে।

ক্ষেত্রফলের পরিমাপ

তোমার বিজ্ঞান বইটা টেবিলের উপর রাখো। এবার একটা চক দিয়ে বইটার চারধার ঘেঁষে টেবিলের উপর দাগ কাটো।

টেবিলের উপর যেখানে বইটা আছে সেখানে বইটাকে না সরিয়ে অন্য কোনো কিছু কি রাখা সম্ভব?

এবার বইটা তুলে নাও। দেখো বইটা টেবিলের উপর এতক্ষণ যে জায়গা দখল করে রেখেছিল সেই জায়গাটা কোনটা?

তাহলে চকের রেখা টেবিলের উপরিতলের যে জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে সেটাই এতক্ষণ বইটা দখল করে রেখেছিল সেই জায়গাটা হলো বইটার **নীচের তলের ক্ষেত্রফল**। এই ক্ষেত্রফল পরিমাপ করার জন্য স্কেলের সাহায্যে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ নেওয়া হয় ও তারপর নীচের সম্পর্কটি ব্যবহার করা হয়। ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ

একটি ফুটবলকে হাত দিয়ে ধরো। তোমার হাত ফুটবলটার ওপরের যে জায়গাটাকে স্পর্শ করতে পারবে, বা ফুটবলটার ওপর হাত বুলিয়ে তুমি যে তলটাকে অনুভব করতে পারো সেই সমগ্র তলটা ফুটবলটির উপরিতল।

এখন তুলি (brush) দিয়ে ঐ পুরো তলটাকে রং করা হলো।

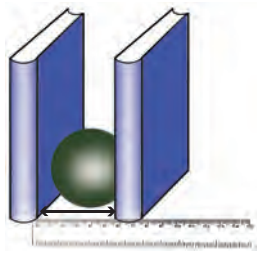

তুমি বলের যে জায়গাটি রং করলে তার পরিমাপ হলো ওই বলটির **ওপরের তলের ক্ষেত্রফল**। এই ক্ষেত্রফল পরিমাপ করার জন্য ফুটবলের ব্যাস পরিমাপ করা হয় ও নীচের সম্পর্কটি ব্যবহার করা হয়।

ক্ষেত্রফল = π × ব্যাস × ব্যাস। [π (উচ্চারণ 'পাই') একটি সংখ্যা, এর মান প্রায় 3.14]

বলটাকে একটা সমতলের ওপর রেখে তার দুপাশে স্পর্শ করে দুটো বই রাখো এবার বইদুটোর দূরত্ব স্কেলের সাহায্যে মাপো। এই মাপই হলো বলটির ব্যাস। (পাশের ছবিতে দেখো)

আয়তনের পরিমাপ

একটা থালা আর একটা কাচের গ্লাস নাও। কাচের গ্লাসটা থালার উপর রেখে সাবধানে গ্লাসটায় কানায় কানায় জল ভরো।

এবার গ্লাসে তোমার হাতের কোনো একটা আঙুল ডুবিয়ে দাও। কী দেখতে পেলে? কেন এমন হলো, ভাবো।

যে জলটা উপচে পড়ল, সেই জল কোথায় ছিল? সেই জলের জায়গায় কি অন্য কিছু এসেছে? এলে সেটা কী?

তাহলে, তোমার আঙুলই জলের জায়গা নিয়েছে। তাই জল উপচে পড়েছে।

তাহলে বলা যায়, আঙুল কিছুটা জায়গা দখল করে।

এবার আঙুলের বদলে একটা চামচ ডুবিয়ে পরীক্ষাটা প্রথম থেকে করে দেখো, একই ঘটনা ঘটে কিনা?

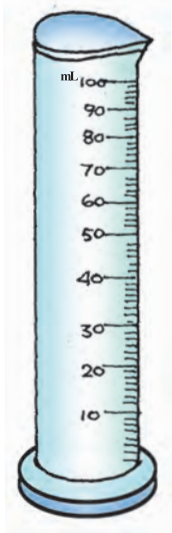

তাহলে বলা যায় যে, বস্তু মাত্রই কিছু স্থান দখল করে থাকে। কোনো বস্তু যতটা স্থান দখল করে থাকে তাকে ওই বস্তুর **আয়তন** বলে।

তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয় একটি পাত্র। পাত্রটি কাচ বা অন্য কোন স্বচ্ছ বস্তু দিয়ে তৈরি করা হয়। পাত্রটির গায়ে একটা স্কেল থাকে। ওই স্কেল থেকেই তরলের আয়তন মাপা হয়। এই পাত্রকে বলে **আয়তন মাপনি চোঙ।**

এসো আমরা একটি পাত্রে কিছু তরল নিয়ে তাকে **আয়তন মাপনি চোঙের** সাহায্যে পরিমাপ করি।

একটা শুকনো আয়তন মাপনি চোঙ নাও। চোঙটাকে টেবিলের উপর খাড়াভাবে রাখো। এখন যে তরলের আয়তন মাপতে হবে, সেটির পুরোটাই খুব সাবধানে ও ধীরে ধীরে চোঙটার মধ্যে ঢালো। তরলটা স্থির অবস্থায় এলে, তরলের ওপরতল চোঙের দেয়ালের স্কেলের যে দাগ স্পর্শ করবে তার পাঠ নাও। ওই পাঠই হলো ওই তরলের আয়তন।

SI পদ্ধতিতে আয়তনের একক 'ঘন মিটার'। আয়তনের আরও প্রচলিত একক আছে যেমন ঘন সেন্টিমিটার (cc), লিটার (L) ইত্যাদি।

জেনে রাখো — 1000 ঘন সেন্টিমিটার = 1ঘন ডেসিমিটার = 1লিটার 1 লিটার = 1000 মিলিলিটার

1 ঘন সেন্টিমিটার =1 মিলিলিটার

সময় পরিমাপ

তোমার বাড়ি থেকে স্কুল হেঁটে যেতে কত সময় লাগে? সাইকেল করে যেতে কত সময় লাগে?

কোনক্ষেত্রে কম সময় লাগল ? তুমি কীভাবে বুঝলে? কোন যন্ত্রের সাহায্য নিলে?

সঠিক ঘড়ির মজাটা হলো, সে সবসময় ঘোরে একইভাবে। অর্থাৎ ওর সেকেন্ডের কাঁটা একবার পুরো ঘুরতে প্রতিবারই 1 মিনিট সময় নেয়। তেমন মিনিটের কাঁটা একবার পুরো ঘুরে আসতে 1 ঘন্টা সময় নেয়। আর ঘন্টার কাঁটা একবার পুরো ঘুরতে 12 ঘন্টা সময় লাগে।

তাহলে, **প্রথমবারের** চেয়ে **দ্বিতীয়বার** তোমার কম '**সময়**' লেগেছে। কিন্তু সময় বলতে কী বোঝায়? — স্কুলে যাওয়ার জন্য যাত্রা শুরু করা আর স্কুলে পৌঁছোনো এই ঘটনা দুটির মাঝে যতক্ষণের ব্যবধান (interval) সেটাই '**সময়**'।

কোন দুটি ঘটনার মধ্যে যতক্ষণের ব্যবধান তাকেই আমরা '**সময়**' বলি।

অসীমা জিজ্ঞেস করল— কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্যকে আমরা চোখে দেখতে পাই, তাই দৈর্ঘ্যের প্রমাণ মাপ একটি প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম দণ্ড নিয়ে ঠিক করা হয়। কিন্তু সময়কে তো চোখে দেখা যায় না তাহলে সময়ের প্রমাণ মাপ ঠিক করা হবে কী করে?

ঈশান বলল— ঠিক কথা। বরং বিষয়টা দিদিমণিকেই জিজ্ঞেস করা যাক।

দিদিমণি ক্লাসে ঢুকতেই অসীমা আর ঈশান প্রশ্নটা করল।

দিদিমণি বললেন— খুব ভালো প্রশ্ন করেছ। সত্যিই সময় আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু তাই বলে চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। উপায় খুঁজে নিতে হবে। আসলে সময় মাপা হয় সৌরদিনের সাহায্যে।

অসীমা বলল— সৌরদিন কী?

দিদিমণি বললেন— দিনের বেলায় যখন তোমার জানালা দিয়ে রোদ এসে প্রথম মেঝেতে পড়েছে তখন থেকে আবার পরদিন ঠিক ওই জানালা দিয়ে মেঝের ঐ জায়গায় সূর্যের আলো আসার মধ্যে সময়ের যে ব্যবধান তাকেই '**এক সৌরদিন**' বলে।

অসীমা বলল— বাঃ, এ তো খুব সোজা ব্যাপার।

হ্যাঁ এবার সারা বছরের সৌরদিন যোগ করে, যোগফলকে 365 দিয়ে ভাগ করে আমরা পাই '**গড় সৌরদিন**'। আর এই গড় সৌরদিনকে আমরা 24 দিয়ে ভাগ করে পাই **1 ঘন্টা**।

ঈশান বলল— আর, ওই 1 ঘন্টাকে 60 দিয়ে ভাগ করে পাব **মিনিট**। তাই না!

—একদম ঠিক।

অসীমা বলল— তাহলে 1 মিনিটকে 60 দিয়ে ভাগ করে আমরা নিশ্চয় পাব **1 সেকেন্ড**।

ঠিক বলেছ। এ ভাবেই সময়ের প্রমাণ মাপ ঠিক করা হয়, আর সেইমতো আমাদের ঘড়িগুলো তৈরি করা হয়।

জেনে রাখা দরকার

1 বছর	=	365 দিন
1 দিন	=	24 ঘণ্টা
1 ঘণ্টা	=	60 মিনিট
1 মিনিট	=	60 সেকেন্ড

পিছনে ফিরে তাকাই

সময় মাপার যন্ত্র হলো 'ঘড়ি'। আজ তুমি যে ঘড়ি ব্যবহার করছ তা কিন্তু বহু বছরের গবেষণার ফল।

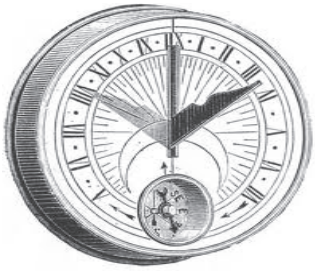

তোমরা স্পোর্টসের মাঠে স্যার বা দিদিমণির কাছে নিশ্চয়ই একটা অন্য ধরনের ঘড়ি দেখেছ যেটা দিয়ে কোনো দৌড় প্রতিযোগী দৌড় শেষ করতে কত সময় নিল তা জানতে পারা যায়। এই ধরনের ঘড়িকে বলে **স্টপ ওয়াচ বা স্টপ ক্লক।**

এই ঘড়ির কাঁটা প্রথম অবস্থায় '**0**' (শূন্য)-র ঘরে থাকে। কাজ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে সুইচ অন (switch on) করলে কাঁটা (hand) ঘুরতে থাকে। আবার, কাজ শেষের সঙ্গে সঙ্গে সুইচে চাপ দিলে কাঁটাটা ওই জায়গাতেই থেমে যায়। ফলে কাজটা করতে কত সময় লাগল তা জানা যায়। এরপর সুইচে চাপ দিলে কাঁটা আবার '**0**' (শূন্য)-র ঘরে ফিরে আসে।

আজকাল আরো আধুনিক '**ডিজিটাল স্টপ ওয়াচ**' ব্যবহার করা হয়। এই ঘড়িতে কাঁটা থাকে না। ঘড়ির স্ক্রিনে ফুটে ওঠে **সংখ্যা বা Digit**। এই ঘড়ি দিয়ে আরও সূক্ষ্মভাবে সময় মাপা যায়। এই ঘড়ি **0.01 সেকেন্ড** পর্যন্ত সময় মাপতে পারে।

আধুনিক জীবনে সময়ের সূক্ষ্ম পরিমাপ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

এমন কোনো কাজের কথা ভাবো তো যেখানে সময়ের খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিমাপও দরকার হয়ে পড়ে।

(i) .....

(ii) .....

খেলার মাঠে প্রতিযোগীদের বিভিন্ন খেলার নির্ভুল সময় মাপতে যে ইলেকট্রনিক ঘড়ি ব্যবহার হয় তাতে 1 সেকেন্ডের 100 ভাগের 1 ভাগ সময়ও মাপা যায়।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার কাজে যে ঘড়ি ব্যবহার করা হয় তা দিয়ে 1 সেকেন্ডের 1 কোটি ভাগের 1 ভাগ সময়ও মাপা যায়।

পরিমাপে অনুমানের গুরুত্ব

আমাদের জীবনে সবসময় **পরিমাপের** যন্ত্র দিয়ে সঠিক **পরিমাপ** করে কাজ করা সম্ভব হয় না। তখন আমাদের **অনুমানের** উপর নির্ভর করতে হয়।

কারণ

কোনো কোনো কাজ করার জন্য সবসময় আমাদের হাতে না থাকে প্রয়োজনীয় সময়, না থাকে প্রয়োজনীয় যন্ত্র। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে তখন আনুমানিক পরিমাপ করা ছাড়া আর কোনো রাস্তা থাকে না।

(1) অনিমেষের সেদিন স্কুলে যেতে বাড়ি থেকে বেরোতেই দেরি হয়ে গিয়েছিল।

আজ আমি ঠিক সময়ে স্কুলে পৌঁছোতে পারব তো? আমায় আজ একটু জোরে পা চালাতে হবে।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। জোরে হেঁটে অনিমেষ ঘেমে নেয়ে স্কুলে গিয়ে পৌঁছোল।

যাক দেরি হয়নি। ঠিক সময়েই পৌঁছোতে পেরেছি।

অনিমেষ বাড়ি থেকে দেরিতে বেরিয়েও কী করে স্কুলে ঠিক সময়ে পৌঁছোতে পারল?

অনিমেষ তার চলার বেগ কতটা বাড়ালে ঠিক সময়ে স্কুলে পৌঁছোতে পারবে তা কী করে হিসাব করল?

(2) তোমার বাড়িতে যিনি রান্না করেন অথবা তোমার বিদ্যালয়ে যিনি বা যাঁরা মিড-ডে মিল রান্না করেন তিনি বা তাঁরা রান্নায় কি নুন, লঙ্কা, মশলা বা তেল নির্দিষ্ট যন্ত্রে পরিমাপ করে ব্যবহার করেন?

তাহলে তিনি বা তাঁরা কীভাবে ওগুলো রান্নায় পরিমাণ মতো ব্যবহার করেন?

তাতে কি রান্নায় কোনো সমস্যা হয়?

(3) সেদিন স্কুলে ক্লাস চলাকালীন জয়িতার শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল। দিদিমণিকে সে কথা বললে, দিদিমণি ওর গায়ে হাত দিয়ে বললেন — 'ইস, তোমার তো জ্বরে গা একদম পুড়ে যাচ্ছে।'

তারপর থার্মোমিটার এনে দেখা গেল, জয়িতার শরীরের উষ্ণতা সত্যিই স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি।

দিদিমণি কী করে বুঝেছিলেন জয়িতার শরীরের উষ্ণতা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি?

(4) ক্রিকেট খেলার সময় নিশ্চয়ই দেখে থাকবে যে, কখনো-কখনো ফিল্ডার দৌড়ে এসে প্রায় বাউন্ডারি লাইনে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলটাকে আটকে দেন।

ফিল্ডার কী করে বলের থেকে নিজের দূরত্ব ইত্যাদি হিসাব করেন? নিজের বেগ কতটা বাড়ালে তবে বাউন্ডারি লাইনের আগেই বলটা আটকানো যাবে তা বুঝতে পারেন?

(5) তুমি যখন সাইকেল চালাও তখন তুমি ঠিক যে জায়গায় থামতে চাও তার কিছুটা আগে থেকে তোমার সাইকেলে ব্রেক কষো আর ঠিক সেই জায়গায় সাইকেল এসে থামে।

এ কাজটা কীভাবে সম্ভব?

যে-কোনো গাড়ির ক্ষেত্রেও তুমি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ যে ড্রাইভার এমনভাবেই ব্রেক কষে যথাস্থানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেন।

তাহলে বুঝতে পারছ, আমাদের জীবনে **আনুমানিক পরিমাপ** বা **আন্দাজ** করার গুরুত্ব কতটা।

তোমরা দলে এরকম কয়েকটা কাজ নিয়ে আলোচনা করো যাতে আনুমানিক পরিমাপ করার প্রয়োজন হয়।

হাতেকলমে

1) তোমার শ্রেণিকক্ষের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা অনুমান করে নীচে লেখো।

আমার শ্রেণিকক্ষের দৈর্ঘ্য = ...m, প্রস্থ = ... m, উচ্চতা = ... m

এবার স্কেল বা ফিতে দিয়ে মেপে দেখত তোমার অনুমান মোটামুটি ঠিক কিনা।

2) তুমি যে বেঞ্চিতে বসো সেই বেঞ্চির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা অনুমান করে লেখো।

আমার বেঞ্চির দৈর্ঘ্য = ... m, প্রস্থ = ... m, উচ্চতা = ... m

এবার আগের মতো আবার স্কেল দিয়ে মেপে তোমার অনুমান যাচাই করো।

3) কয়েকটা পাথর জোগাড় করো। এবার ওই পাথরগুলোর ভর কত হতে পারে অনুমান করে লেখো।

প্রথম পাথরের ভর = ... g

দ্বিতীয় পাথরের ভর = ... g

তৃতীয় পাথরের ভর = ... g

এবার ওই পাথরগুলোর ভর, ভরমাপার যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করিয়ে তোমার অনুমান যাচাই করে নাও।

রাজমিস্ত্রি কাজের আগে ওই কাজের জন্য কী কী জিনিস কতটা পরিমাণে লাগবে তার আনুমানিক হিসাব দেন। বিষয়টা নিয়ে দলে আলোচনা করো।

তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, জীবনে **সঠিক পরিমাপেরও খুব দরকার আছে।**

একটা ওষুধ তৈরি করতে কোন উপাদান কতটা লাগবে তা যথেষ্ট সচেতনতার সঙ্গে সূক্ষ্ম হিসাব করার দরকার হয়।

ওষুধ তৈরির সময় কোনো উপাদান একটু বেশি হলে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

এরকম আরও উদাহরণ নিয়ে দলে আলোচনা করো।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির পরিমাপ

কদিন আগে অনুরাধা আম খেয়ে আঁটিটা মাঠের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। আজকে হঠাৎই সে দেখল যে, আঁটিটা থেকে একটা ছোট্ট আমগাছের চারা বেরিয়েছে। আবার কয়েক বছর পর ওই চারাগাছই হয়ে উঠবে একটা ফলন্ত আমগাছ।

অনুরাধার বাড়ির পাশে রমাদিদের গোয়াল ঘরে বছরকয়েক আগে বাছুরটা জন্মেছিল। আজ সে একটা বড়োসড়ো গোরু। পড়ার টেবিলে রাখা ছোট্টবেলার ছবিটা দেখে অনুরাধা ভাবে, আজ সে কতটা বড়ো হয়ে গেছে!

অনুরাধা ওদের বাগানের শিউলি গাছটায় গত শরতে দেখেছিল, গিজগিজ করছে কত শুঁয়োপোকা। অথচ এরাই তো প্রজাপতি হয়ে ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায়!

গতকালও জবাগাছের যে কুঁড়িগুলো অনুরাধা দেখেছিল, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে সবকটাই ফুল হয়ে গেছে।

এভাবে সব জীবের বৃদ্ধি হয়, বৃদ্ধি হয় জীবের বিভিন্ন অঙ্গের অথবা জীবের শরীর যা যা দিয়ে তৈরি তাদের।

কোনো ব্যক্তির বৃদ্ধি তার উচ্চতা বা দৈর্ঘ্য আর দেহের ওজন দিয়ে বোঝা যায়। প্রত্যেক মানুষের বয়স অনুযায়ী উচ্চতা ঠিকঠাক না হলে বুঝতে হবে সেই ব্যক্তি অপুষ্টিতে ভুগছেন। উদ্ভিদ বা প্রাণীর পুষ্টি ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা নানা ভাবে বোঝা যায়। মানুষের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ওজন মাপলে যদি দেখা যায় বয়স অনুযায়ী ওজন ঠিক আছে, তবে বলা যেতে পারে তার পুষ্টি স্বাভাবিক। এছাড়াও উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে জীবের পুষ্টি ঘটে। পুষ্টি হলো একটি শারীরিক প্রক্রিয়া আর তার ফলাফল হলো স্বাস্থ্য। পুষ্টি ভালো হলে স্বাস্থ্যের লক্ষণগুলোও ভালো হয় (যেমন - মসৃণ ও উজ্জ্বল ত্বক, দুর্গন্ধহীন নিঃশ্বাস, কম মেদ, সুগঠিত পেশি, দৃঢ় ও মজবুত হাড়, ভালো ঘুম, কায়িক শ্রমে সহজে ক্লান্তি না আসা ইত্যাদি)। মাছ, মাংস, ডিম, ফল, দুধ ইত্যাদি প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ লবণ-সমৃদ্ধ খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে খেলে স্বাভাবিক পুষ্টি ঘটে। ফলে জীবের দেহ গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ যথাযথ হয়। সুগঠিত দেহ ভালো স্বাস্থ্যকে নির্দেশ করে। আর স্বাস্থ্য ভালো না খারাপ তা ধরা পড়ে বিভিন্ন বৃদ্ধিসূচক পরিমাপের সময় (ওজন, উচ্চতা পরিমাপ, মাথা ও বুকের পরিধি পরিমাপ, মধ্যবাহুর পরিধি পরিমাপ ইত্যাদি)।

উদ্ভিদের বৃদ্ধির পরিমাপ

তোমরা কি জানো উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরিমাপের যন্ত্রের কথা? এসো একটু পরিচয় করে নিই। উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরিমাপ করা হয় — 'অক্সানোমিটার' বা 'আর্ক অক্সানোমিটার' যন্ত্র দিয়ে।

গ্রিক শব্দ '*auxein*' কথার অর্থ To grow অর্থাৎ বৃদ্ধি হওয়া আর *metroe* কথার অর্থ To measure বা পরিমাপ করা।

পরের পাতায় আর্ক অক্সানোমিটার-এর ছবিটা ভালো করে লক্ষ করো।

$$\text{বৃদ্ধির হার} = \frac{\text{বৃদ্ধি}}{\text{সময়}}$$

উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধির পরিমাপ খুব জরুরী, চাষের কাজে ফলের বাগান তৈরির সময় তা কাজে লাগে। উদ্ভিদের কাণ্ডের গায়ে যে গাঁটের মতো অংশ যাকে সেগুলো হলো পর্ব। দুটো পর্বের মধ্যবর্তী অংশ হলো পর্বমধ্য। পর্ব

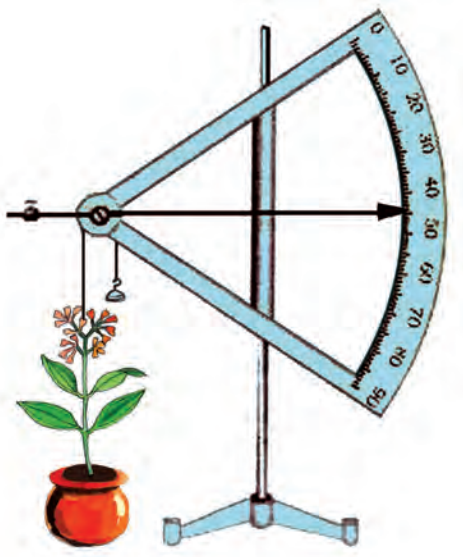

অক্সানোমিটার

থেকে পাতা বের হয়। পর্বের সংখ্যা, পর্বমধ্যের দৈর্ঘ্য, পাতার সংখ্যা, পাতার পরিমাপ থেকে উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

আচ্ছা, একটা চারা গাছের কোন অংশটা কেমন করে বাড়ে? দেখবে? এসো নিজেরা করে দেখি।

একটা টবে লাগানো ছোটো গাছ নাও। একটা ছোলা বা মটর চারা হতে পারে, আবার একটা ছোটো ফুলের চারা বা তুলসীগাছও হতে পারে। আর লাগবে একটা মাপার ফিতে, আর একটা মার্কার পেন।

* প্রথমে গাছটার কাণ্ডে কটা পর্ব আছে গুনে নাও।
* এবার নীচ থেকে প্রথম দুটি পর্বমধ্য কতটা লম্বা মেপে নাও।
* এবার ওই দুটি পর্বের প্রতিটিতে কয়টি পাতা আছে গুনে নাও।
* প্রতিটি পাতা কতটা লম্বা আর কতটা চওড়া মেপে নাও।
* আবার ওপর থেকে প্রথম দুটি পর্বমধ্য কতটা লম্বা মাপো।
* ওই দুটি পর্বের প্রতিটিতে কয়টি পাতা আছে গুনে নাও।
* প্রতিটি পাতা কতটা লম্বা আর কতটা চওড়া মেপে নাও।

এরকমভাবে সাত দিন অন্তর তিনবার মাপ নাও। এবং তা নীচের সারণিতে লেখো।

	বিষয়	প্রথম মাপ (প্রথম দিন)	দ্বিতীয় মাপ (7 দিন পরে)	তৃতীয় মাপ (14 দিন পরে)
	মোট পর্ব			
কাণ্ডে মার্কার পেন দিয়ে দেওয়া দাগের ওপরের অংশ	পর্বমধ্যের দৈর্ঘ্য			
	পর্বে পাতার সংখ্যা			
	পাতার দৈর্ঘ্য			
	পাতার প্রস্থ			
কাণ্ডে মার্কার পেন দিয়ে দেওয়া দাগের নীচের অংশ	মোট পর্ব			
	পর্বমধ্যের দৈর্ঘ্য			
	পর্বে পাতার সংখ্যা			
	পাতার দৈর্ঘ্য			
	পাতার প্রস্থ			

এবার এসো, মজাটা দেখি।

বলো তো, প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয় ধাপে পর্বের মোট সংখ্যা কত ?

.....

তাহলে, পর্বের সংখ্যা বেড়েছে, না কমেছে?

.....

পর্বের সংখ্যা কোন দিকে বেড়েছে, নীচে না ওপরে?

.....

বলতে পারো, গাছের কোন্ অংশ থেকে নতুন পর্ব তৈরি হয়?

..... (প্রয়োজনে বন্ধুদের বা শিক্ষক/শিক্ষিকাকে জিজ্ঞাসা করো।)

সব পর্বমধ্যগুলোই কি লম্বায় বেড়েছে? বেড়ে থাকলে, কোনগুলো বাড়েনি? আর কোনগুলো বেড়েছে?

.....

তেমনি দেখত, সব পাতাগুলো লম্বা চওড়ায় বেড়েছে কিনা? না বেড়ে থাকলে, কোনগুলো বেড়েছে, আর কোনগুলো বাড়েনি?

.....

.....

তাহলে, গাছের কোন অংশটা বাড়ে, আর কোন অংশটা বাড়ে না, লেখো।

প্রয়োজনে, তোমার বন্ধুদের আর শিক্ষক/শিক্ষিকাকে জিজ্ঞাসা করে নাও।

এবার এসো জেনে নিই উদ্ভিদের - 'ভর' কী করে পরিমাপ করবে।

হাতেকলমে

এই হাতেকলমে কাজটা শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গেই করবে।

সজীব উদ্ভিদের ভর পরিমাপ (Measuring fresh weight of a plant)।

1) খুব সাবধানে একটা জীবন্ত চারাগাছ মাটি থেকে তুলে নাও। খেয়াল রাখো যাতে গাছটার শিকড় ছিঁড়ে না যায়।

2) এবার জল দিয়ে ভালো করে সমস্ত মাটি ধুয়ে ফেলো।

3) এবার একটা নরম তোয়ালে দিয়ে ভালোভাবে সমস্ত জল মুছে ফেলো।

4) সঙ্গে সঙ্গে (সময় নষ্ট না করে) চারা গাছটার ভর সূক্ষ্ম তুলাযন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করো। (গাছে থাকে প্রচুর পরিমাণ জল, দেরি হলে গাছ শুকিয়ে যেতে পারে, তাতে পরিমাপে ভুল হবে।)

এবার পরিমাপ করা গাছের 'ভর' নীচে লিখে ফেলো। এভাবে চারাগাছটার ছ -মাসের তালিকা তৈরি করো।

ভর পরিমাপ

'ভর' পরিমাপ করা হয় সাধারণ তুলা-র সাহায্যে। অধুনা স্প্রিং তুলা যন্ত্র দিয়েও ভর মাপা হচ্ছে। পাশে এমন কয়েকটা যন্ত্রের ছবি দেওয়া হলো। মানুষের ক্ষেত্রে ভর মাপার যন্ত্র আকারে ছোটো ও অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে যন্ত্রের আকারটা বড়ো হয়।

প্রাণীর বৃদ্ধির পরিমাপ

মানুষসহ সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রেই বৃদ্ধির হার পরিমাপের পদ্ধতি একই। পরিমাপের যন্ত্রও এক, কিন্তু আকৃতির পার্থক্য থাকে। উচ্চতা সাধারণত 'সেন্টিমিটার স্কেলে' মাপা হয়।

পাশের ছবিটা খেয়াল করো, এমন উচ্চতা মাপার যন্ত্র তোমরা খেলার (sports) মাঠে দেখে থাকবে।

উচ্চতা মাপার সময়, পরিমেয় ব্যক্তিকে মেরুদণ্ড টান টান করে, দু-পা জোড়া করে পাদানির উপর দাঁড়াতে হবে। (অনেক যন্ত্রে পাদানি থাকে না)। সূচকটিকে মাথার তালুর সঙ্গে লাগিয়ে মাপ নিতে হবে।

তোমরা বন্ধুরা একসঙ্গে মিলে তোমাদের উচ্চতা মাপো। দেখো তো, উচ্চতার কী পরিচয় পাও। হ্যাঁ, তোমাদের বয়সটাও সেইসঙ্গে লেখো।

ক্রম.	নাম	বয়স	উচ্চতা (সেমি)

দেখে বলো, তোমাদের মতো বয়সে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর উচ্চতা কতটা হয়ে থাকে?

.....

এর চেয়ে বেশি বা কম উচ্চতা কতজনের আছে?

.....

বেশি : .....

কম : .....

এবার এসো, একটা মজার জিনিস দেখি। এর জন্য অবশ্য তোমাকে বাড়িতে কাজ করতে হবে। তোমার ভাই-বোন, বন্ধুদের ভাই-বোন, হয়তো বা পাড়ার ছোট্ট বাচ্চাদের শরীরের মাপ নিতে হবে।

কাদের মাপ নেবে?

(1) শিশু : 2-3 বছরের কোনো বাচ্চার মাপ নাও।

(2) বালক/বালিকা : 4-6 বছরের কোনো ভাই বা বোনের মাপ নাও।

(3) কিশোর/কিশোরী : 11-14 বছরের কোনো সমবয়সি বন্ধু বা দাদা বা দিদির মাপ নাও।

কীভাবে মাপ নেবে?

(1) মাথা : ভ্রূ-র ঠিক ওপর দিয়ে মাথা বেড় দিয়ে মাপ নিতে হবে।

(2) দেহকাণ্ড : কাঁধ থেকে তলপেট পর্যন্ত দেহকাণ্ড। পিঠের দিকে শিরদাঁড়া বরাবর। কাঁধ থেকে নীচ পর্যন্ত মাপ নিতে হবে।

(3) হাত: কাঁধ থেকে আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত।

এসো এবার সারণিতে ফেলে দেখি।

	ক্রম	নাম	বয়স	পরিমাপ (সেমি)			মাথা : দেহকাণ্ড
				মাথা	দেহকাণ্ড	হাত	
শিশু							
বালক/বালিকা							
কিশোর/কিশোরী							

শিশুদের মাথা আর দেহকাণ্ডের মাপের অনুপাত কত থেকে কত?

.....

বালকদের/বালিকাদের ক্ষেত্রে এই অনুপাত কত থেকে কত?

.....

কিশোরদের/কিশোরীদের ক্ষেত্রে এই অনুপাত কত?

.....। পরে একসময় দেহকাণ্ড ও হাতের অনুপাতও মিলিয়ে দেখো।

এবারে বাড়িতে বাছুর, ছাগলছানা, বেড়ালছানা, হয়তো খরগোশ বা গিনিপিগ ছানার বৃদ্ধি মেপে দেখত, কী পেলে?

অনুপাতগুলো মিলিয়ে দেখে বলো, দেহের কোন অংশটা তুলনায় সবচাইতে বেশি বেড়েছে?

.....

আর কোনটা বেড়েছে সবচাইতে কম?

.....

এবার তাহলে দেহের অংশগুলোকে (মাথা, হাত, দেহকাণ্ড) তাদের বৃদ্ধির হার হিসেবে কম থেকে বেশির দিকে সাজাও (মানে প্রথমে লেখো, যেটা বাড়ে সবচেয়ে কম আর শেষে লেখো, যেটা বাড়ে সবচেয়ে বেশি)

(1) ..... → (2) ..... → (3) .....

তাহলে এবার বলো, বেড়ে ওঠার সময় সব অঙ্গগুলো কি একই হারে বেড়ে ওঠে?

.....। এটাই প্রাণীদের বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য।

এসো, এবার একই রকমের ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের ভর মেপে দেখি কীভাবে দেহের ভর বয়সের সঙ্গে বৃদ্ধি পায়।

	ক্রম	নাম	বয়স	ভর (কিগ্রা)	গড় ভর (কিগ্রা)
শিশু					
বালক					
কিশোর					
প্রাপ্তবয়স্ক					

এবার মিলিয়ে দেখি, কোন বয়সে ওজন বেশি বাড়ে:

ওপরের চার্টটি থেকে নীচের ফাঁকা স্থানে গড় বয়সগুলো লেখো?

শিশু : ..... কিগ্রা।
বালক : ..... কিগ্রা।
কিশোর: ..... কিগ্রা।
প্রাপ্তবয়স্ক : ..... কিগ্রা।
তাহলে ওজন বাড়ল কতটা? বিয়োগ করে বলো।
শিশু থেকে বালক হবার সময়ে ..... কিগ্রা।
বালক থেকে কিশোর হবার সময়ে ..... কিগ্রা।
কিশোর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হবার সময়ে ..... কিগ্রা।
কোন বয়সে ওজন বাড়ল সবচেয়ে বেশি?
শিক্ষক / শিক্ষিকাকে জিজ্ঞেস করে বুঝে নাও, শতাংশে ভর বৃদ্ধি কতটা হলো।

6 বল ও শক্তির প্রাথমিক ধারণা

স্থিতি, গতি ও শক্তির ধারণা

রবিন স্কুলে যাবে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। বাড়ির সামনে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ। বটগাছের পাশে একটা গোরু ঘাস খেতে খেতে মনের সুখে মাঠের উপর চরে বেড়াচ্ছে। রাস্তা দিয়ে হুস করে চলে গেল একটা অটোরিকশা, বাইক আর সাইকেল। রাস্তার পাশ দিয়ে ওর স্কুলের আরও কত ছাত্রছাত্রী যাচ্ছে স্কুলের দিকে। আকাশে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে পাখি। রাস্তার পাশে কত ছোটো বড়ো বাড়ি।

রবিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এমন কোন কোন বস্তু দেখল যারা চলাচল করছে না, অর্থাৎ নিজের জায়গাতেই স্থির আছে?

এই বস্তুগুলো কি সময়ের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করছে?

যে বস্তু সময়ের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে না তাকে **'স্থির বস্তু'** বলে।

এই মুহূর্তে তোমার চারপাশে যেসব স্থির বস্তু রয়েছে তাদের নাম খাতায় লেখো।

এখন রবিনের দেখা 'স্থির বস্তু' নয় এমন অন্যান্য বস্তুগুলোর নাম লেখো।

এবার বলো এই বস্তুগুলো কি সময়ের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করছে?

যে বস্তুগুলো সময়ের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে, তাদের বলে **গতিশীল বস্তু**।

এই মুহূর্তে তোমার চারপাশে যে বস্তুগুলো গতিশীল তাদের নাম খাতায় লেখো।

তুমি চলন্ত ট্রেনে বা বাসে জানালার ধারে বসে বাইরের দিকে তাকালে বাইরের বস্তুগুলোকে কি রকম অবস্থায় দেখতে পাও? স্থির না চলমান?

ট্রেনের জানালার পাশে বসে পপির দেখা দৃশ্য

তুমি যদি ট্রেনের বাইরে মাঠে বা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে তাহলে ওই বস্তুগুলোকে তুমি কেমন দেখতে? স্থির না চলমান?

আবার ট্রেন বা বাসের ভিতরে বসে ভেতরের দিকে তাকালে যখন বসার সিট, মেঝে বা ছাদ দেখো তখন তাদের কীরকম দেখো? সচল না স্থির?

যদি ট্রেনের বাইরে মাঠে বা রাস্তায় দাঁড়িয়ে তুমি ট্রেনের ভেতরের ওই জিনিসগুলোকে দেখতে পেতে, তাহলে তাদের কেমন দেখাত? সচল না স্থির?

তাহলে, কোনো বস্তু 'স্থির' না 'গতিশীল' -তা যে দেখছে তার অবস্থার উপর নির্ভর করে।

বলের ধারণা ও একক

হাতে কলমে

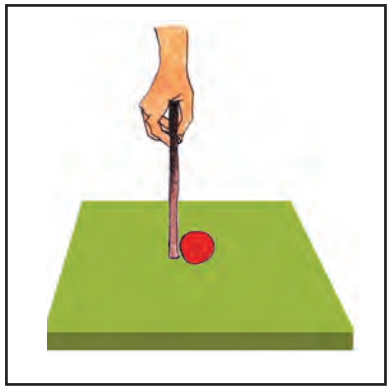

1. মসৃণ মেঝের উপর একটা ছোটো রাবারের বল রাখো। এবার একটা লাঠি দিয়ে আস্তে বলটাকে ধাক্কা দাও।

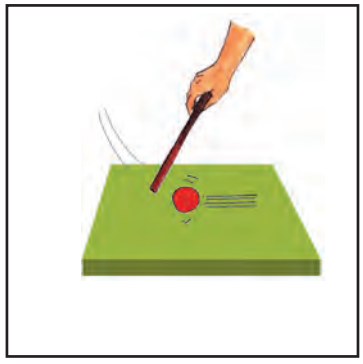

বলটা কি স্থির থেকে সচল হলো?

2. বলটাকে আবার সচল করো। চলন্ত বলটাকে এবার বলটা যে দিকে যাচ্ছে সেই দিক করে ওই লাঠি দিয়ে ধাক্কা দাও।

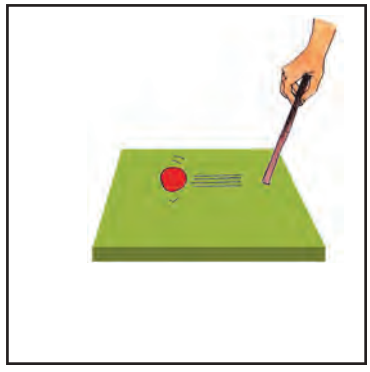

বলটার বেগ কী বেড়ে গেল?

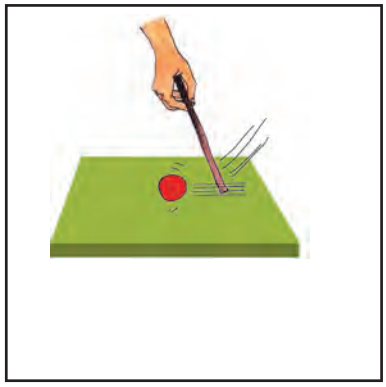

3. বলটাকে আবার সচল করো। এবার বলটা যে দিকে যাচ্ছে তার উলটোদিক থেকে বলটাকে এমনভাবে আস্তে ধাক্কা দাও যাতে বলটা থেমে না গিয়ে ওই একই দিকে গতিশীল থাকে।

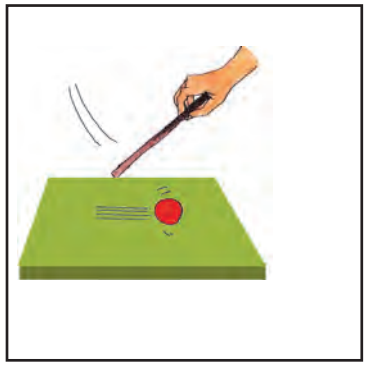

বলটার বেগ কী কমে গেল?

4. এবার ওই চলন্ত বলটাকে পাশ থেকে ধাক্কা মারো।

কী দেখতে পেলে? বলটা যে দিকে চলছিল, ধাক্কার পরেও কি সেই দিকেই চলছে, না চলার দিক বদলে গেছে?

5. বলটাকে আবার সচল করো। এবার, বলটাকে লাঠিটা দিয়ে একেবারে থামিয়ে দাও।

উপরের এইসব পরীক্ষা থেকে তুমি কী দেখলে? কোনো স্থির বস্তুকে গতিশীল করতে বা গতিশীল বস্তুর বেগ বাড়াতে,

কমাতে বা শূন্য করে দিতে বা গতির দিক বদল করতে বাইরে থেকে ওই বস্তুর ওপর ক্রিয়া করতে হয়।

ক্রিকেট বা ফুটবল খেলার মাঠে বল প্রয়োগের এমন উদাহরণ খুঁজে পাও কিনা আলোচনা করো।

নীচের ছকে আমাদের প্রতিদিনের কিছু কাজের কথা লেখা আছে। কোন কাজে টানা, কোন কাজে ঠেলা আর কোন কাজে টানা বা ঠেলা দুটি দরকার। প্রতিটি কাজের পাশে ফাঁকা জায়গায় টিক '✓' চিহ্ন দাও।

কাজ	টানা	ঠেলা
ড্রয়ার বের করলে		
ড্রয়ার বন্ধ করলে		
ফুটবলে কিক করলে		
জামার বোতামের ফুটো দিয়ে তুমি বোতাম ঢোকালে		
দরজা খুললে		
দরজা বন্ধ করলে		
টেবিলকে সরালে		
গাছ থেকে ফুল তুললে		
বঁটি দিয়ে একটা ফল কাটলে		
কুঁয়ো থেকে জল তুললে		
ব্যাগের চেন খুললে		
ব্যাগের চেন আটকালে		
প্লাগ পয়েন্টে প্লাগ গুঁজলে		
প্লাগ পয়েন্ট থেকে প্লাগ খুলে নিলে		
জামার টিপ বোতাম খুললে		
কোল্ড ড্রিংকের বোতলের ছিপি খুললে (বটল ওপেনার দিয়ে)		

তাহলে, সারাদিন নানা কাজে আমাদের কখনও জিনিস টানতে বা কখনও ঠেলতে হয়। এই টানা বা ঠেলা হলো বল প্রয়োগ করা।

বলের প্রভাব

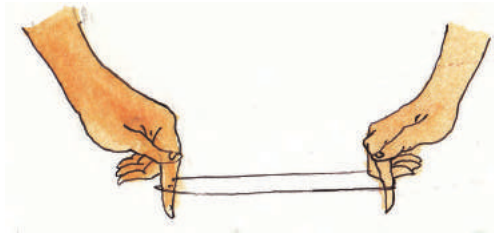

হাতেকলমে

একটা রাবার ব্যান্ড নাও। এবার দু-পাশ থেকে টান দাও

কী দেখতে পেলে?

রাবার ব্যান্ড প্রসারিত হলো কেন?

একটা স্পঞ্জ-এর টুকরো নাও। এখন স্পঞ্জটাকে হাতের তালুর উপর রাখো। এবার হাত জোরে মুঠো করো।

হাত মুঠো করার পর স্পঞ্জটার কী হলো?

স্পঞ্জ চুপসে গেল কেন?

এবার একটা স্প্রিং নাও।

স্প্রিং-এর দু-পাশ থেকে ছবির মতো চাপ দাও।

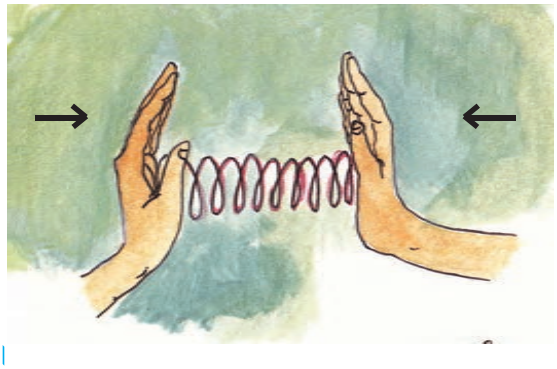

কী দেখতে পেলে? স্প্রিংটার আকৃতির কী পরিবর্তন হলো?

এখন ছবির মতো করে স্প্রিংটাকে দু-পাশ থেকে টান দাও।

কী দেখতে পেলে? স্প্রিংটা কি প্রসারিত হয়ে দৈর্ঘ্যে বেড়ে গেল?

তাহলে সংকোচন বা প্রসারণ ঘটানোর জন্য বল প্রয়োগের প্রয়োজন।

তাহলে, বল কোনো বস্তুর আকৃতি বা আয়তন পরিবর্তন করতে পারে।

তোমরা দেখেছ যে, কোনো স্প্রিং-কে দু-দিক থেকে জোরে চেপে ধরলে সেটা যতটা সংকুচিত হয়, আলতো করে চাপলে ততটা সংকুচিত হয় না।

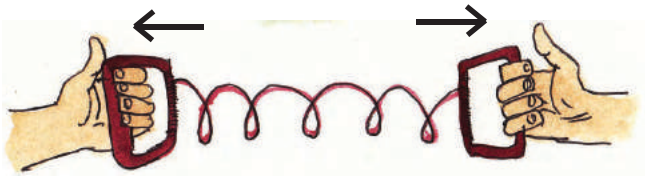

তেমনি থেমে থাকা কোনো ফুটবলকে পা দিয়ে ধাক্কা দিলে সেই ফুটবল অনেক দূর এগোবে যদি ধাক্কা জোরালো হয়। আর যদি আলতো করে ধাক্কা দাও তাহলে সেই ফুটবল বেশি দূর যাবে না।বোঝা গেল যে, বলের মান যত বেশি, বলের প্রভাবে সংঘটিত ঘটনার মাত্রাও তত বেশি।

বলের মান বেশি না কম, তা আন্দাজ বা পরিমাপ করার জন্য বলের প্রয়োগের ফলাফল দেখা বা পরিমাপ করা হয়।

তাহলে বলা যায় — বাইরে থেকে প্রযুক্ত যে কারণের ফলে স্থির বস্তু সচল হয় অথবা সমবেগে গতিশীল বস্তু থেমে যায় বা তার বেগ বাড়ে বা কমে বা বেগের দিক পরিবর্তন হয় অথবা ওই বস্তুর আকৃতি বা আয়তনের পরিবর্তন হয় সেই কারণকে **বল (Force)** বলে। **SI** পদ্ধতিতে বলের একক **নিউটন**। অন্য আর এক পদ্ধতিতে বলের একক **ডাইন**।

স্পর্শহীন বল

হাতে কলমে

নীচের সারণিটা পূরণ করো।

ঘটনা	কী দিয়ে বল প্রয়োগ করছ ?	কীসের উপর বল প্রয়োগ করছ?	তারা একে অপরকে স্পর্শ করছে কি?	স্পর্শ না করলে কী হতো?
তুমি পা দিয়ে ফুটবলে ধাক্কা দিচ্ছো				
হাতুড়ি দিয়ে পেরেক পুঁতছ				
পেন দিয়ে লিখছ				

ওপরের সারণি থেকে আমরা কী দেখতে পেলাম? সারণিতে উল্লেখ করা প্রতিটি ক্ষেত্রেই বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করার জন্য বস্তুকে স্পর্শ করতে হয়। কিন্তু তুমি যদি একটা চুম্বক নিয়ে তার কাছাকাছি একটা লোহার পেরেক রাখো, তবে কী দেখতে পাবে?

দেখা যাবে পেরেকটাকে স্পর্শ না করেও চুম্বকটা পেরেকটাকে আকর্ষণ করছে। তাহলে স্পর্শ না করেও বস্তুর ওপর বলপ্রয়োগ করা যায়, এই পরীক্ষাটা তা প্রমাণ করে।

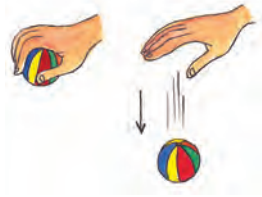

তবে চুম্বক কিন্তু সব বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করতে পারে না। চুম্বক নির্দিষ্ট কিছু পদার্থের ওপরই বল প্রয়োগ করতে পারে। সেই পদার্থগুলোকে বলে চৌম্বক পদার্থ। যেমন লোহা, নিকেল, কোবাল্ট ইত্যাদি।

একটা রবারের বলকে হাত থেকে ছেড়ে দাও। বলটা নীচের দিকে পড়তে শুরু করল। কেউ বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করলে কি কোনো স্থির বস্তু নিজে থেকে চলতে শুরু করে? তাহলে কে রবারের বলটির ওপর নীচের দিকে বল প্রয়োগ করল?

এক্ষেত্রে এই বল প্রয়োগ করেছে পৃথিবী। কোনো স্পর্শ ছাড়াই এই বল ক্রিয়া করেছে। এই বলের নাম অভিকর্ষ। এই বলেরই আরেক নাম হলো 'ওজন'। যেহেতু ওজন একটি **বল (Force)** তাই **SI** পদ্ধতিতে ওজনের একক 'নিউটন'।

ওজনকে পরিমাপ করা হয় স্প্রিং তুলা যন্ত্রের সাহায্যে। সূচকযুক্ত একটা স্প্রিং-এর পাশে একটা ওজন নির্ণায়ক স্কেল থাকে। সূচকটি প্রাথমিকভাবে স্কেলের শূন্য দাগকে সূচিত করে। স্প্রিং-এর নীচের দিকের খোলা প্রান্তে যুক্ত থাকা আংটায় বস্তুকে ঝুলিয়ে দিলে স্প্রিং প্রসারিত হয়। তখন স্কেলের ওপর সূচকের অবস্থান থেকে বস্তুর ওজন জানা যায়।

শক্তির ধারণা, প্রকারভেদ, উৎস ও শক্তি সমস্যা

খেলার মাঠে বা পার্কে অনেকক্ষণ খেলাধুলা করে যখন তুমি ঘরে ফেরো, অথবা সারাক্ষণ স্কুল করে যখন তুমি বাড়ি ফেরো অথবা সারাদিন পিকনিক করে যখন তুমি বাড়ি ফেরো —

তখন কি তোমার শরীরে কাজ করার সামর্থ্য থাকে?

তাহলে ভেবে বলো তো পরিশ্রম করলে আমাদের দেহ থেকে কী খরচ হয়ে যায় যার জন্য আমাদের কাজ করার সামর্থ্য কমে যায়?

অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকলেও কি তোমার এমন হয়? তখনও কাজ করার সামর্থ্য কি তোমার থাকে?

পরিশ্রম করলে আমাদের দেহ থেকে শক্তি খরচ হয়, যা আমরা পাই খাদ্য থেকে। কাজ করার সামর্থ্যই হলো শক্তি।

শক্তির প্রকারভেদ

একটা পোড়া- মাটির ভাঁড় (মিষ্টির ভাঁড়) নাও। একটা পাথর দিয়ে ভাঁড়টাকে স্পর্শ করো।

ভাঁড়ের কি কোনো ক্ষতি হলো বা সরে গেল?

এবার ভাঁড়টাকে মাটির উপর রেখে দূর থেকে জোরে ভাঁড়টাকে লক্ষ করে ওই পাথরটাকে ছুঁড়ে মারো।

এবার কী ভাঁড়টা ভেঙে গেল অথবা সরে গেল?

প্রথম ক্ষেত্রে ভাঁড়ের কোনো ক্ষতি হয়নি, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হলো কেন?

তাহলে কি পাথরটার গতিই পাথরটার মধ্যে বাড়তি সামর্থ্য জুগিয়ে ছিল?

গতিশীল অবস্থায় বস্তুর মধ্যে কাজ করার যে সামর্থ্য বা শক্তি আসে, তাকে বলে গতিশক্তি (Kinetic Energy)।

তোমার বিদ্যালয়ের ঘন্টাটা এক হাতে ঝোলাও। অন্য হাতে একটা হাতুড়ি নাও। এবার হাতুড়িটি ঘন্টার গায়ে ছুঁয়ে রাখো।

কোনো শব্দ হলো কি?

এবার হাতুড়িটা ঘন্টা থেকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে জোরে ঘন্টার গায়ে আঘাত করো।

এবার শব্দ উৎপন্ন হলো কেন?

প্রথমবার হাতুড়ি স্থির থাকায় তার মধ্যে কোনো গতিশক্তি ছিল না, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হাতুড়ি গতিশীল থাকায় হাতুড়ির মধ্যে কাজ করার সামর্থ্য তৈরি হয়েছে। তাই দ্বিতীয় বার শব্দ উৎপন্ন হয়েছে।

ঝড়ে কখনো-কখনো বাড়ির ছাউনি উড়িয়ে নিয়ে যায়, ঘর-বাড়ি ভেঙে ফেলে, গাছ বা গাছের ডাল ভেঙে ফেলে।

ঝড়ের প্রচণ্ড গতির জন্য তার মধ্যে গতিশক্তির জোগান হয়। ফলে তা কাজ করার সামর্থ্য লাভ করে।

বায়ুর গতি শক্তি কাজে লাগিয়ে পাল তোলা নৌকা চালানো হয়।

এক বালতি জল নাও। এবার বালতিটা হেলিয়ে ওই জল নরম মাটিতে বা বালির উপর ঢেলে দাও।

মাটিতে বা বালির উপর কি গর্ত তৈরি হলো?

এবার জলসুদ্ধ বালতিটা বেশ কিছুটা উপরে তুলে বালতি থেকে নরম মাটির উপর ক্রমাগত জল ঢালতে থাকো।

কী দেখতে পেলে?

এবার কি জল ঢালার জায়গাটা গর্ত হয়ে গেল? কেন হলো?

আসলে জলসুদ্ধ বালতিকে তুমি উপরে তোলায় জলসুদ্ধ বালতির মধ্যে কাজ করার শক্তির জোগান হয়েছিল। এই শক্তিকে স্থিতিশক্তি বলে। ওই স্থিতিশক্তি পড়তে থাকা জলের গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে জলের কাজ করার সামর্থ্য বাড়িয়ে দিয়েছে।

একটা পিংপং বল টেবিলের ওপর রাখো। এবার একটা স্টিলের স্কেল ওই বলটার গায়ে স্পর্শ করে রাখো।

বলটা কি সরে বা ছিটকে গেল?

এবার ছবির মতো করে স্টিলের স্কেলটাকে বাঁকিয়ে দু-হাতে ধরে তার সামনে একটা পিংপং বল রাখো এবং ছবির মতো করে বাঁহাতটা ছেড়ে দাও।

কী দেখতে পেলে?

পিংপং বলটা ছিটকে গেল। কেন?

প্রথম ক্ষেত্রে স্কেলটার আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। বলটি স্থির আছে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্কেলটার আকৃতির পরিবর্তন হয়েছে ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলটা ছিটকে গেছে।

তবে নিশ্চয়ই স্কেলটার আকৃতি পরিবর্তন করাতেই তার মধ্যে কাজ করার সামর্থ্যে জোগান হয়েছিল। তাই বলটা ছিটকে গিয়েছিল।

প্রথম ক্ষেত্র

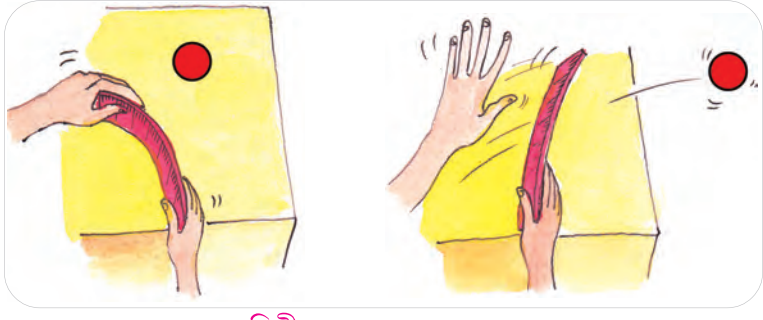

দ্বিতীয় ক্ষেত্র

তাহলে, বস্তুর আকৃতির পরিবর্তন ঘটালে বস্তুর মধ্যে কাজ করার সামর্থ্য বা শক্তির জোগান হয়। এই শক্তিকে স্থিতি শক্তি বলে।

একটা স্প্রিংকে টেবিলের উপর ছবির মতো করে আটকে দেওয়া হলো।

এবার স্প্রিংটার উপর একটা ক্যাম্বিস বল রাখা হলো। এবার বলসুদ্ধ স্প্রিংটাকে জোরে চেপে সংকুচিত করো। তারপর হাত সরিয়ে নাও।

কী দেখতে পেলে ? বলটা ছিটকে গেল কেন?

স্প্রিংটাকে চাপ দেওয়ায় তার আকৃতির পরিবর্তন হয়। স্প্রিংটা সংকুচিত হয়ে পড়ে। ফলে স্প্রিং-এর মধ্যে স্থিতি শক্তির জোগান হয় এবং তার মধ্যে কাজ করার সামর্থ্য আসে। তাই হাত তুলে নিলে বলটা ছিটকে যায়। বস্তুর আকৃতির পরিবর্তন ঘটালে বস্তুর মধ্যে কাজ করার সামর্থ্য বা শক্তির জোগান হয়। এই শক্তিকেও স্থিতিশক্তি বলে। স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তিকে একত্রে যান্ত্রিক শক্তি বলে।

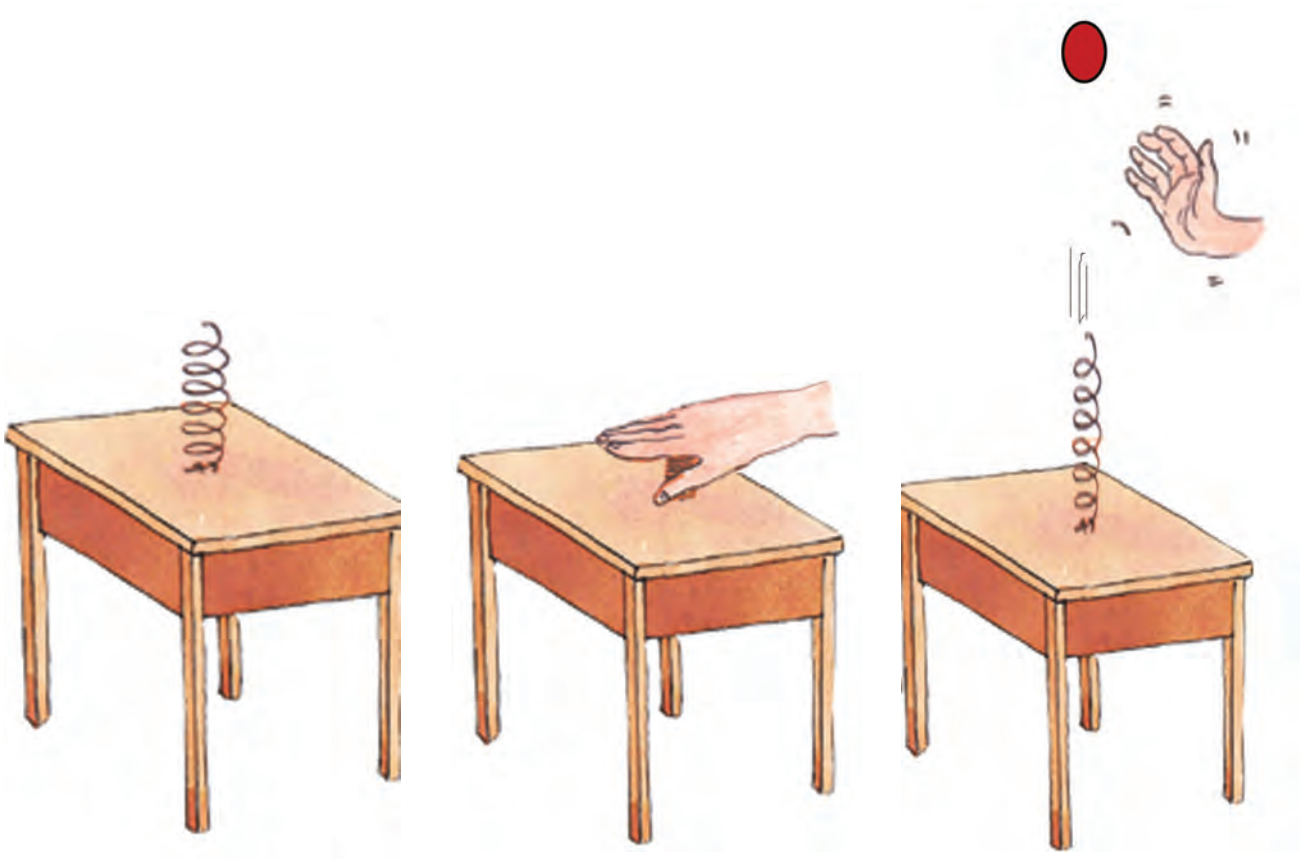

শক্তির রূপান্তর

শক্তি প্রকৃতিতে নানা রূপে থাকতে পারে। এক ধরনের শক্তি অন্য ধরনের শক্তিতে রূপ বদলে নেয় মাত্র।

হাতেকলমে

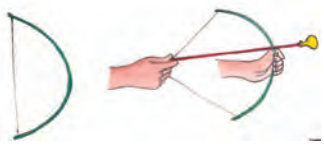

এমন একটা গাছের বাঁকানো ডাল নাও যা সহজে ভাঙে না । এবার গাছের ডালটা আরও একটু বাঁকিয়ে সেটার দু-প্রান্তে একটা দড়ির দু-প্রান্ত টাইট করে বেঁধে দাও। আর একটা সরু ও শক্ত লাঠি নাও। লাঠির ডগায়ে একটা ছোটো রবারের বল ফুটো করে লাগিয়ে নাও। এটা তোমার তির। তোমার তির ধনুক তৈরি। এবার ফাঁকা মাঠে গিয়ে ছবির মতো করে তির ছোঁড়ো।

তিরটা ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল। খেয়াল করে দেখো যখন তুমি ধনুকের দড়িতে টান দিলে তখন ধনুকের আকৃতির পরিবর্তন হলো। ফলে তার মধ্যে স্থিতিশক্তির জোগান হলো কিন্তু যখন তিরটা ছুটে গেল তখন তিরের মধ্যে গতিশক্তির জোগান হলো।

তির কোথা থেকে পেল এই গতিশক্তি?

তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে ধনুকের স্থিতিশক্তি তিরের মধ্যে গতিশক্তিতে রূপ বদলাল।

শক্তির অনেক প্রকার :

1) যান্ত্রিক শক্তি, 2) তাপ শক্তি, 3) শব্দ শক্তি, 4) আলোক শক্তি,

5) তড়িৎ শক্তি, 6) চৌম্বক শক্তি, 7) রাসায়নিক শক্তি ও 8) পারমাণবিক শক্তি।

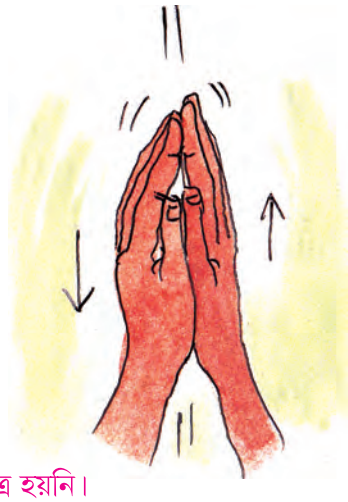

নমস্কারের ভঙ্গিতে দু-হাত জোড় করে রাখো।

এবার জোরে জোরে দু-হাতের তালু পরস্পর ঘষো।

এবার দু-হাতের তালুতে কী অনুভব করলে?

এই তাপ কোথা থেকে এল?

প্রথম ক্ষেত্রে কোনো তাপ উৎপন্ন হয়নি, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাপ উৎপন্ন হলো কেন?

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দুই তালুর মধ্যেকার ঘর্ষণ বলের বিরুদ্ধে হাত গতিশীল হয়েছে যা প্রথম ক্ষেত্রে হয়নি।

অতএব যান্ত্রিক শক্তিই তাপ-শক্তিতে রূপ বদলেছে।

একটা লাঠিকে 'ঢাক' বা 'টেবিলের' উপর স্পর্শ করে রাখো।

কোনো শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে কি?

এবার লাঠিটা দিয়ে 'ঢাক' বা 'টেবিলের' উপর আঘাত করো।

এবার 'শব্দ' উৎপন্ন হলো কি? কেন?

যান্ত্রিক শক্তিই এখানে শব্দ শক্তিতে রূপ বদলেছে।

এবার পরের পাতায় ঘটনাগুলো নিয়ে দলে আলোচনা করে দেখো সেগুলো যান্ত্রিক শক্তি শব্দ শক্তিতে রূপ বদলের উদাহরণ কিনা।

আর এটাও দেখো কোনটা 'যান্ত্রিক শক্তি' আর কোনটা 'শব্দ শক্তি'।

(1) ঘন্টা বাজানো হচ্ছে, 2) তবলা বাজানো হচ্ছে, (3) রেললাইনের উপর দিয়ে রেলগাড়ি যাওয়ার সময় ঘড়ঘড় শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে, (4) তুমি হাততালি দিচ্ছ।

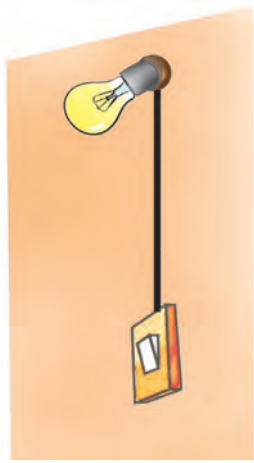

এরকম তোমরা তোমাদের চারপাশের পরিবেশে দেখা আরও ঘটনা নিয়ে আলোচনা করো।

বৈদ্যুতিক পাখার সুইচটা 'অন' করো।

পাখাটা কি চলতে আরম্ভ করল?

পাখাটার সুইচ এবার 'অফ' করে দাও।

পাখাটার চলা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল কেন?

তাহলে পাখাটার সুইচ 'অন' করলে কোন শক্তি পাখাটাতে সরবরাহ হয়? সুইচ 'অফ' করলে সেই শক্তি সরবরাহ কি বন্ধ হয়ে যায়?

অতএব বোঝা গেল বৈদ্যুতিক শক্তিই পাখাটাকে চলতে সাহায্য করল। তাই এক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপ বদলাল।

বালব বা টিউবের সুইচ 'অন' করলে বালব বা টিউব জ্বলে অর্থাৎ আলো দেয়।

এক্ষেত্রে কোন শক্তি কোন শক্তিতে রূপ বদলাল বলতে পারো?

নীচের পরীক্ষাটা তুমি নিজে করবে না। শিক্ষক / শিক্ষিকারা করে দেখাবেন।

অল্প পরিমাণে পোড়া চুন একটা স্টিলের ছড়ানো বাটিতে নেওয়া হবে। তারপর ওই বাটিতে অল্প জল (প্রয়োজন মতো) ঢালা হবে।

কী দেখতে পাচ্ছ?

খুব সাবধানে বাটির গায়ে হাত দাও।

কী অনুভব করলে? এই তাপ এল কোথা থেকে?

পোড়া চুন আর জলের মধ্যে 'রাসায়নিক বিক্রিয়া' হয়। এর ফলে উৎপন্ন হয় তাপ।

তাহলে এক্ষেত্রে 'রাসায়নিক শক্তি' তাপ শক্তিতে রূপ বদলেছে।

একটা চুম্বক নাও। চুম্বকটাকে একটা পেরেকের কাছে নিয়ে যাও।

লোহার পেরেকটা চুম্বকের দিকে এগিয়ে এল কি? কেন এগিয়ে এল?

চুম্বকের আকর্ষণ ধর্মের জন্য চুম্বকটা লোহার পেরেকটাকে আকর্ষণ করেছে। লোহার পেরেকটা চুম্বকের চেয়ে হালকা তাই তা চুম্বকের দিকে এগিয়ে গিয়ে চুম্বকের গায়ে আটকে গেছে।

এক্ষেত্রে চৌম্বক শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে (পেরেকের চুম্বকের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় উৎপন্ন গতি শক্তিতে) রূপ বদলেছে।